দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ২৯ জুন ২০১৫।। ১৩ আষাঢ় - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাস

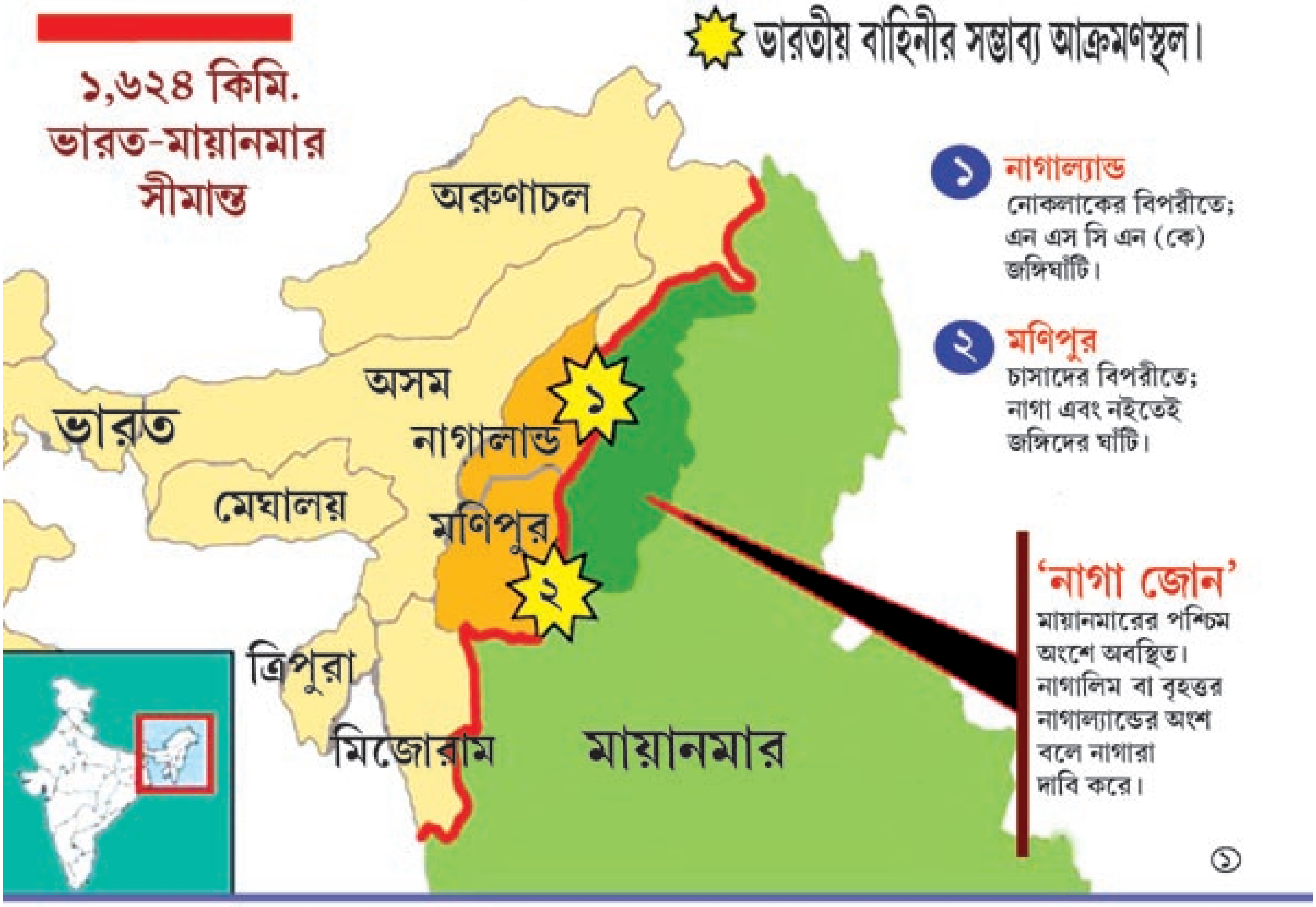

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৯ জুন - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করাই বিরোধীদের লক্ষ্য □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : পার্টিগণিতের যোগ-বিয়োগ □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

বিশ্বব্যাপী ইসলামি সন্ত্রাসের ধারায় পশ্চিমবঙ্গেও জঙ্গি ইসলামি উত্থান এবং বিপন্ন জাতীয়তা ভাবনা □ দেবব্রত ঘোষ □ ১২

বিদেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতে সন্ত্রাস ঘটালে তাৎক্ষণিক যোগ্য জবাব মিলবেই □ মে: জে: কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অব:) □ ১৪

উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদ রুখতে পারলেই দেশের নিরাপত্তা সুসংহত হবে □ অভিরূপ নাগচৌধুরী □ ১৬

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গিদের মোকাবিলায় নীতির পুনর্বিবেচনা করুক কেন্দ্র □ জ্যোতিলাল চৌধুরী □ ১৮

অম্বুবাচী □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১

মহাকবি কালিদাস □ অশোক কুমার দাস □ ২২

সামরিক সাফল্য বুক বাজিয়ে জানান দিতে হবে □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৭

ভয়ঙ্কর অপরাধ দমনে চাই কড়া শাস্তি □ সুহাস বসু □ ২৯

রামায়ণের ঐতিহাসিক প্রমাণে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □

অন্যরকম : ৩৩ □ **সুস্বাস্থ্য : ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** □ **রঙ্গম : ৩৯-৪০** □ **শব্দরূপ : ৪১** □

চিত্রকথা : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যা শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

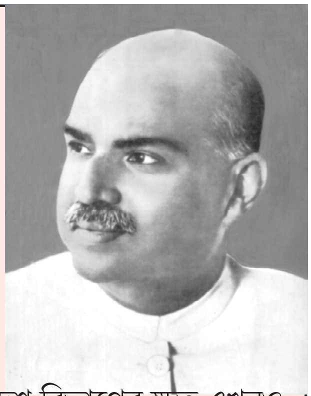

প্রকাশিত হবে ৬ জুলাই, ২০১৫

ভারত তথা বাংলায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান আজও প্রাসঙ্গিক। দেশ বিভাগের ক্ষত এখনও শুকায়নি, হিন্দু শরণার্থীদের একাংশ এখনও এদেশে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারেনি, কাশ্মীর আজও গলার কাঁটা। এইসব প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েই এবারের শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা। লিখেছেন অনির্বাণ গাঙ্গুলী, মোহিত রায়, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন, অন্যথায় অতিরিক্ত কপি পাওয়া যাবে না।।। মূল্য : ১০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারত পথিক

তাঁহাকে যতই স্বৈরাচারী হিন্দুত্ববাদী অহঙ্কারী বলিয়া বিদ্রূপ করা হউক না কেন আদতে তিনি একজন দেশহিতৈষী সৈনিক। একজন সৈনিক যেমন দেশের ঝাণ্ডা উঁচু করিয়া তুলিতে সবসময় স্বপ্ন দেখেন তিনিও তেমন করিয়া ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। এইটাই তাঁহার স্বভাব। যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন গুজরাটকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন দেখিতেন এবং সেই কাজে সফলও হইয়াছেন। এখন তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। প্রথম দিন হইতেই তাঁহার প্রচেষ্টা চলিতেছে ভারতবর্ষকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলিকে সমগ্র বিশ্বের সামনে হাজির করা। তাঁহার সেই প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ আজ জগৎসভায় ভারতের যোগ সম্মিলিত হওয়া। বিশ্ব যোগ দিবসের স্রষ্টা হিসাবে ইতিহাস তাঁহাকে মনে রাখিবে। কারণ এই ব্যবস্থার সফল রূপকার তিনি। এই সাফল্য তাঁহাকে অহঙ্কারী করে নাই বরং বিনয়ী করিয়াছে। এই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছেন, আমরা শুধু একটা দিবস পালন করিতেছি না, শান্তি ও সৌহার্দ্যের একটা নতুন যুগ আনিবার জন্য প্রশিক্ষিত করিতেছি।' শান্তি ও সৌহার্দ্যের জন্য প্রথমদিন হইতেই তিনি প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। প্রতিবেশী দেশগুলিকে লইয়া বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর করিতে তিনি সচেষ্ট।

বিশুদ্ধবাদীরা অবশ্য বলিতেছেন, এই যোগ সেই যোগ নয়। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের শিক্ষক অরিন্দম চক্রবর্তী এক প্রতিবেদনে লিখিয়াছেন, যোগচর্চা চলিবে নীরবে। কংগ্রেসের দিগ্বিজয় সিং বলিয়াছেন— ইহা তামাশা। বহু বছর পূর্বে স্বামীজী যখন বেদান্তকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে লড়াই করিতেছেন তখন এই দেশের গোঁড়া রক্ষণশীলরা একই কথা বলিয়াছিলেন। বেদান্ত গুরুগৃহে চর্চার বিষয়, বিশ্বে বিক্রয় করিবার বিষয় নয় বলিয়া স্বামীজীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ স্বামীজী দর্শিত বেদান্ত সমগ্র বিশ্বে আলোড়িত হইতেছে। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য বলা যাইতে পারে—আমাদের নিজগৃহে সোনা বা হীরের খনি রহিয়াছে অথচ আমরা সেই খনির কোনো খবর রাখি না। সেই খনি যে অজস্র রত্নে ভরা তাহা আমরা জানিতেও চাহি না। ভারতপ্রেমী নরেন্দ্র মোদী দেশের এই গৌরবকে বিশ্বের সামনে তুলিয়া ধরিতে সচেষ্ট হইয়াছেন বলিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটা মহল বিরোধিতা করিতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব পর্যন্ত যখন যোগ দিবস লইয়া অত্যন্ত উৎসাহী এবং এই দিনটি লইয়া উদ্দীপনাকে তিনি অভূতপূর্ব বলিয়াছেন তখন কংগ্রেস বামেদের যোগ বিরোধিতা দেশদ্রোহিতারই নামান্তর। বিদেশের উচ্ছিষ্টভোজী বামদলগুলির এই বিরোধিতা স্বাভাবিক। আর এক বিদেশিনীর হাতে পড়িয়া কংগ্রেস এই দেশের সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে ধ্বংস করিতে সদা সচেষ্ট। কংগ্রেস, তৃণমূল এবং বামদলগুলির পক্ষে প্রচার করা হইয়াছিল যোগ মুসলমান ধর্ম-বিরোধী। কিন্তু বহু মুসলমান রাষ্ট্র এবং মুসলমান সম্প্রদায় যোগে অংশগ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, যোগ একটি অসামান্য অভ্যাস। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরম্পরাকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যে বিপথে চালিত করিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন আজকের প্রধানমন্ত্রী যোগকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার কিছুটা হইলেও পুনরুদ্ধার করিলেন।

এই লজ্জায় কংগ্রেসের শিক্ষা হইবে কি? দেশের জাতীয়তা, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে বিসর্জন দিয়া যে অপ-সংস্কৃতির আমদানি করিয়াছিল কংগ্রেস তাহা এখন বিসর্জন করিবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। যদিও যে কোনো ভালো কাজে বিরোধিতা এবং বাধা থাকিবে। ভারতবর্ষ যে তাহার নিজস্ব পথেই বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে যোগদিবস সেই দিকে একটি পদক্ষেপ।

সুভাষিতম্

যাবদ্ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেন দণ্ডমর্হতি।। ভাগবত ৭/১৪/৮

যে পরিমাণ অর্থে উদরপূর্ণ ভোজন হয়, সেই পরিমাণ অর্থেরই মানুষের অধিকার। যে ব্যক্তি তদতিরিক্ত ধন আত্মসাৎ করে সে চোর এবং দণ্ডের যোগ্য।

আন্তর্জাতিক যোগদিবস ভারতের বৌদ্ধিক বিজয় : রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ‘‘বিশ্বকে ভারত অনেক কিছু দিয়েছে, তা সত্ত্বেও আজও যাঁরা ভারতকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন তাঁদের কাছে ২১ জুন দিনটি যোগ্য জবাব। সারা দুনিয়া ভারতের ‘যোগ’কে স্বীকার করে আর একবার ভারতের প্রাচীন পরম্পরার প্রতি সম্মান জানালো। এটা ভারতের বৌদ্ধিক বিজয়।’’ ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে গত ২০ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন সমিতির পক্ষে কলকাতা বাগবাজার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে এভাবেই কথাগুলি বললেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিশ্বের বহুদেশ একে সমর্থন করেছে। পৃথিবীর সর্বত্র যোগ অনুশীলনে অংশগ্রহণ করবেন অসংখ্য মানুষ। একে আমাদের আরও বিস্তৃত করতে হবে; এ আমাদের গৌরব।’’

বাগবাজার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চ প্রকৃতপক্ষে ২০ জুন বিকাল ৩টে থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত পর্যন্ত এক মনোরম যোগ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলো। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান ক্রীড়া ভারতীর আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদযাপন সমিতির সম্পাদক বিভাস মজুমদার। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল, বিশেষ অতিথি যোগাচার্য রাজীব মালভী, যোগদিবস উদযাপন সমিতির সভাপতি মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) এস এন মুখার্জী, প্রখ্যাত সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত-সহ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পতঞ্জলি যোগপীঠ, আর্ট অব লিভিং, গায়ত্রী পরিবার প্রভৃতি সংস্থার সন্ন্যাসী ও কার্যকর্তাগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাননীয় রাজ্যপাল ১৬টি যোগ সংস্থাকে সংবর্ধনা জানান। ৩ জন ইন্টারন্যাশনাল যোগ-চ্যাম্পিয়ানের মাকে সম্মান জানান স্বয়ং রাজ্যপাল। এরা হলেন কাঁথির সৌগতা জানার মা কবিতা জানা, নদীয়ার মোহনকুমার সিংহের মা শোভা সিংহ এবং কলকাতা বরানগরের দীপান্বিতা মণ্ডলের মা অনিতা মণ্ডল। অনুষ্ঠানের স্মরণিকা উন্মোচন করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল। তিনি জানান, আগামীদিনে স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে যোগ অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তাভাবনা চলছে। গোয়া থেকে আগত যোগাচার্য রাজীব মালভী যোগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে যোগ প্রদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ৯টি সংস্থার পক্ষ থেকে যোগের বিভিন্ন ধারা ও আঙ্গিকের উপস্থাপনা করা হয়। আর্ট অব লিভিং-এর অদিতি মুখার্জীর নেতৃত্বে এক মনোজ্ঞ উপস্থাপনা করেন সংস্থার সদস্যরা। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সূর্যনমস্কার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ পরিবেশিত হয়। পতঞ্জলি যোগসমিতির পক্ষ থেকে প্রাণায়ামের বিভিন্ন প্রকরণ যেমন কপালভাতি, অনুলোম-বিলোম প্রদর্শিত

‘আই এন এ বিরাট’ রণতরীতে যোগাভ্যাস করছেন ভারতীয় নৌসেনারা।

ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চে রাজ্যপাল-সহ বিশিষ্টজনেরা।

হয়। বিদ্যাবিকাশ পরিষদের কচিকাঁচারা যোগনৃত্যের অপূর্ব উপস্থাপনার মাধ্যমে ভারতমাতার বন্দনা করে। তাজপুর সরস্বতী শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা বিভিন্ন যোগকৌশল পরিবেশন করে। এছাড়াও যোগাসনের বিভিন্ন ভঙ্গিমা প্রদর্শন করে যোগ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল যোগ অ্যাসোসিয়েশন এবং বেঙ্গল যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

এক নজরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

▯ আন্তর্জাতিক যোগদিবসে দিল্লীর রাজপথে যোগাভ্যাসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন ৩৫,৯৮৫ জন।

▯ ৮৪ টি দেশের প্রতিনিধি এক স্থানে বসে যোগ অনুশীলন করলেন।

▯ দুটিই বিশ্বরেকর্ড। জানিয়েছে গিনেস বিশ্বরেকর্ড সংস্থা।

▯ সারা ভারতে ২০ কোটি (২০০ মিলিয়ন) মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

▯ ১৯১টি দেশে ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে যোগদিবস পালন করা হয়েছে।

▯ তিন লক্ষ সেনাবাহিনীর জওয়ান এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

বস্তুতপক্ষে এরা সবাই যোগের বিভিন্ন কলাকৌশল দেখিয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়।

প্রাপ্ত সূত্রে খবর, গত ২১ জুন ক্রীড়াভারতীর উদ্যোগে সার্বজনিক যোগ প্রদর্শন দক্ষিণবঙ্গে ৮৪০ স্থানে ও উত্তরবঙ্গে ২৫০ স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় এ দিনটিকে পালন করেছে। ব্যাঙ্গালুরুর স্বামী বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান কেন্দ্র যোগের দ্বারা 'মধুমেহমুক্ত ভারত সপ্তাহ' পালনের জন্য এদিন থেকেই কাজ শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, ভারত ছাড়া আরো ১৯১টি দেশের ২৫১টি শহরে সাড়ম্বরে এই দিনটিতে অসংখ্য মানুষ যোগ অনুশীলনে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে ৪৭টি মুসলমান দেশও রয়েছে। এদিনেই ভারত গিনেস বুকে দু'টি রেকর্ড করে ফেলল। এক স্থানে ৩৫, ৯৮৫ জন মানুষ যোগাভ্যাস করলেন এবং ৮৪টি দেশের মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। এদিন সিয়াচেন থেকে সমুদ্র যোগময় হয়ে গেল ভারত।

সূর্যের প্রথম আলো যেখানে পড়েছে, সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টায় শেষ আলো যেখানে পড়বে, এই গোটা যাত্রাপথে এমন কোনো স্থান থাকবে না যেখানে যোগ অভ্যাসকারীদের সূর্যদেবের আশীর্বাদ করার সুযোগ থাকবে না। গোটা বিশ্বকে সে কথা স্বীকার করতে হবে।

—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সিয়াচেনে যোগাভ্যাস করছেন ভারতীয় সৈনিকরা।

আক্রান্ত ক্রিকেট ভক্ত সুধীর গৌতম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশে আক্রান্ত ভারতীয় ক্রিকেটের একনিষ্ঠ ভক্ত সুধীর গৌতম। গত ২১ জুন মীরপুর দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচ শেষে এই ঘটনা ঘটে। বিহারের বাসিন্দা বছর ৩৫-এর সুধীর জানান, খেলা শেষ হওয়ার পর একদল বাংলাদেশি সমর্থক তাঁকে ঘিরে ধরে চড় থাপ্পড় মারতে থাকে। কারণ ম্যাচ চলাকালীন তাঁকে শাঁখ বাজাতে বারণ করলে তিনি তা উপেক্ষা করেন এবং ভারত মেলবোর্নে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়েছিল বলে তার বদলা স্বরূপ তাঁকে আক্রমণ করে। তিনি আরও জানান, ক্ষিপ্ত জনতা চিৎকার করছিল, 'আমরা মেলবোর্নে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের হারের বদলা নিয়েছি, এবার ময়দানের বাইরেও বদলা নেব'। এরপর পুলিশের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হন সুধীর গৌতম। কিন্তু এতেই থেমে থাকেনি বাংলাদেশি সমর্থকরা। সুধীরের হাতে থাকা ভারতের জাতীয় পতাকা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পতাকার লাঠিও ভেঙে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থল থেকে ফিরতে অটোয় উঠলে সেখানেও তাঁকে লক্ষ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের সঙ্গে ইঁটপাটকেলও ছোঁড়া হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। উল্লেখ্য,

সুধীর গৌতম

ভারতীয় দল দেশে এবং দেশের বাইরে যেখানেই খেলতে যায় সেখানেই ভারতের তেরঙ্গা পতাকা এবং শাঁখ নিয়ে হাজির থাকেন সুধীর। সচীনভক্ত সুধীর ধ্যান-জ্ঞান বলতে শুধুই ক্রিকেট। তাই যেখানেই খেলা হয় তাঁকে দেখা যায়।

কিন্তু এর আগে কোনোদিন এরকম ঘটনার সম্মুখীন হননি তিনি। তবে বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

মালদায় বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ জালনোট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত মে মাসে মালদার দু'টি পৃথক অঞ্চল থেকে বিএসএফ দুই খেপে বিপুল পরিমাণ জালনোট উদ্ধার করেছে। প্রথম বারে বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত একটি অঞ্চল থেকে ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার মূল্যের এবং ১২ মে কালিয়াচক থেকে ৯ লক্ষ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ জালনোট ও ৮০০ গ্রাম আফিম বাজেয়াপ্ত করে। ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করার জন্য হুজি সহ সীমান্তপারের অন্যান্য ইসলামি মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে হাবিবুল রহমান, আব্দুল মুতালিক-সহ জালনোট চক্রের কয়েকজনকে হায়দরাবাদ ও চেন্নাই থেকে গ্রেপ্তার করার পর এই চক্রটি সুপ্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই বিপুল পরিমাণ জালনোট উদ্ধার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। এন আই এ সূত্রের খবর, গত ৯ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই কেসটির তদন্তের ভার এন আই এ-এর হাতে তুলে দেয়। এরপর তারা দুটি পৃথক ঘটনায় পৃথকভাবে দুটি মামলা রুজু করে। এখনও পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তারের খবরাখবর পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জালনোট কারবারীরা মূলত নির্মাণশিল্পের সঙ্গে জড়িত গরিব মানুষদের এই নোট ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনে আবারও উঠে এল পাকিস্তানের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে দু'রকম নীতি নিয়ে চলছে। একদিকে দেশের হামলা চালানো টিটিপি-এর মতো সন্ত্রাসবাদী দলগুলির প্রতি দমনমূলক নীতি নিলেও লস্কর-ই-তৈইবা ও তার সহযোগী দলগুলির সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধে কোনোও ব্যবস্থা নিচ্ছে না পাকিস্তান। রাষ্ট্রসঙ্ঘ চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি তাদের নাম পরিবর্তন করে, পূর্বের নিষিদ্ধ গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে তাদের 'কানেকশন' বা সম্পর্ক গোপন করে তারা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ পাক-সরকার তাদের অর্থসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে উদাসীন। 'কাউন্টারিং দ্য ফিনান্সিং অফ টেরোরিজম' সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

অপরদিকে ভারত সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ইসলামি স্টেট-এর ভীতি প্রদর্শনকে (আইসিস) ভারত সরকার কোনোমতেই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না। যদিও ভারত থেকে খুব কমসংখ্যক মুসলমানেরই আইসিসে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবুও ভারতের বিপুল মুসলমান জনসংখ্যা, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে তাদের অবনমন এবং আইসিসের অনলাইন প্রচারে প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় মুসলমানদের একাংশের এই উগ্রসন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

চীনা ভাষায় গীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনা ভাষায় প্রকাশিত হলো গীতা। এর আগে হিন্দুদের এই পবিত্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন

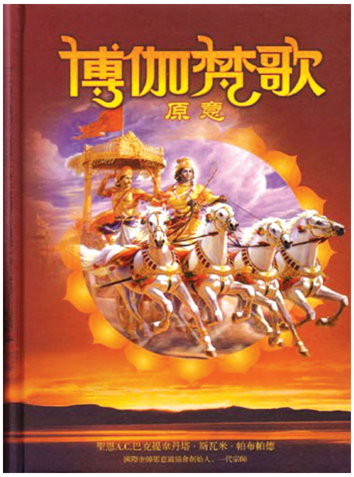

ভাষায় অনুবাদ হলেও চীনা ভাষায় অনুবাদ এই প্রথম। সাংহাই-এর জোমিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক ওয়াং-ঝু-চেং এবং লিং হাই গীতার অনুবাদ করেন। পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের প্রকাশ চীনের মতো একটি কমিউনিস্ট প্রভাবিত দেশে হওয়ায় এক আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগ কনফারেন্সে চীনা ভাষার গীতা উন্মোচন করা হয়। যোগদিবস অনুষ্ঠানে চীনে অবস্থানরত ভারতের রাষ্ট্রদূত অশোক কুমার কন্ঠ বইটি উন্মোচন করেন। চীনা ভাষার গীতার ভূমিকা লেখেন কে. নাগরাজ নায়ডু। যিনি গুয়াংঝাউ প্রদেশে ভারতীয় দূতাবাসের কনসাল জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছেন। তবে গীতার প্রসঙ্গ ছাড়াও যোগ শিক্ষাতে ভারতীয় যোগগুরুদের ডাক পড়েছে চীনে। ভারত-চীন আন্তর্জাতিক যোগ উৎসবে গত ৫ দিন ধরে ২১ জন ভারতীয় যোগগুরু যোগের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন চীনে।

‘হাই অন যোগা অ্যাট থার্টিফাইভ থাউজেনডস্ ফিট’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবস জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে পালিত হলো। সিয়াচেনের গভীর হিমবাহে ভারতীয় সৈনিকরা যোগ দিবস পালন করেছেন, নৌসেনারা গভীর সমুদ্রে রণতরীতে করেছেন, তেমনি স্পাইস জেট

বিমান কোম্পানি তাদের কয়েকটি উড়ানেও যোগদিবস পালন করেছে। বিমান কোম্পানি এই উড়ানগুলির নাম রেখেছিল ‘হাই অন যোগা অ্যাট থার্টিফাইভ থাউজেনডস্ ফিট’। কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এবং নির্দেশক অজয় সিংহ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, স্পাইস জেট পৃথিবীর বিমান সংস্থাগুলির মধ্যে ‘প্রথম যোগ প্রদর্শনকারী বিমান কোম্পানি’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করায় গর্বিত। আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীর যোগ দিবস যোজনায় সামিল হতে পেরে উৎসাহিত অনুভব করছি।’

এক বিবৃতিতে বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, চালক-সহ বিমানের সমস্ত কর্মচারী এবং যাত্রীরা নিজ নিজ আসনে ১০ মিনিট যোগ অনুশীলন করেন।

পাকিস্তানে যোগগুরু শামসাদ হায়দার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবস বিশ্বের ১৯১ দেশে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হলেও প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান-সহ কয়েকটি মুসলমান দেশ সামিল হয়নি। কিন্তু

পাকিস্তানের যোগী শামসাদ হায়দার প্রায় নীরবেই নিজের দেশে দীর্ঘ দশ বছর ধরে ঘটিয়ে চলেছিল যোগ বিপ্লব। বছর সাতচল্লিশের হায়দার দীর্ঘ কয়েকবছর যোগের টানে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিব্বত, ভারত ও নেপাল। শিখেছেন ধ্যান ও রোগ আরোগ্যের বহু প্রাচীন কৌশল। তিনি হঠযোগ, কুণ্ডলিনী, ধ্যান, প্রাণায়াম-সহ যোগের প্রায় সব শাখাতেই দক্ষতা অর্জন করেছেন। ‘যোগ পাকিস্তান’-এর প্রতিষ্ঠাতা হায়দার ধর্মের হানাহানি, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে দীর্ণ পিছিয়ে পড়া ‘পাক’ সমাজ তথা দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের নৈরাশ্যে ডুবে থাকা নাগরিক সমাজকে উদ্দীপিত করতে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে যোগকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘ওয়ে অফ্ নেচার’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। যার মূল উদ্দেশ্যই হলো সমাজ থেকে প্রত্যেক মানুষের মানসিক চাপ, সমাজসংক্রান্ত সমস্যা ও হিংসা দূরীভূত করা। সেদেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচালিত হয়েছে তাঁর ভাবধারা ও কর্মধারা। বিগত এক বছর ধরে তিনি পাকিস্তানের ‘আর্মড ফোর্সেস ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন’-এর মাসিক সংবাদ সংকলন ‘হিলাল’-এ যোগের উপকারিতা ও বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লিখে চলেছেন।

ললিত মোদীকে নিয়ে বখরার লড়াই

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করাই বিরোধীদের লক্ষ্য

একদা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের মুকুটহীন রাজা ললিত মোদীর ভিসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের কর্তাদের উপর প্রভাব খাটানোর অভিযোগে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা নেই যে বিতর্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সৎ এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করা। সুষমা স্বরাজ উপলক্ষ্য মাত্র। একথা সত্যি যে পর্তুগালের হাসপাতালে ললিত মোদীর ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর জরুরি অপারেশনের সময় সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য সুষমা বৃটিশ হাইকমিশনকে ললিত মোদীর ভিসার আবেদন মানবিক কারণে মঞ্জুর করার অনুরোধ করেছিলেন। এই অনুরোধকে দুর্নীতি এবং প্রভাব খাটানো বলা যায় কি না তা ভেবে দেখা দরকার। মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর পাশে উপস্থিত থাকতে চেয়ে স্বামীর আবেদনে সাড়া দিয়ে সুষমা স্বরাজ কত বড় অপরাধ করেছেন অথবা দেশের মানুষের কত বড় ক্ষতি করেছেন সে বিচার করবে কে?

কংগ্রেস ও জনতা দল ইউনাইটেড যুক্তভাবে বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে। সংবাদমাধ্যমে একতরফাভাবে কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্যই তুলে ধরা হচ্ছে। সাংবাদিক হিসাবে একটা কথা বলতে পারি যে সমস্ত সংবাদের নেপথ্যে অনেক এমন ঘটনা, ছলচাতুরি, প্রতিহিংসা থাকে যা অপ্রকাশিত থাকে। সুষমা স্বরাজের ক্ষেত্রেও আছে রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং টাকার খেলা। আই পি এল ক্রিকেট কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া ললিত মোদী অপরাধী কি না তার বিচার আদালত করবে, সাংবাদিক বা রাজনৈতিক নেতারা নন। মনে রাখতে হবে দিল্লী হাইকোর্ট ললিত মোদীর পাসপোর্ট তাঁকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জন্য মোদী সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা বি সি সি আই-এর অন্দরমহলে যেতে হবে। একই

গূঢ় পুরুষের

কলম

সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে বি সি সি আই সারা বিশ্বে এক নম্বর ধনী ক্রিকেট সংস্থা।

যেখানে টাকার গন্ধ সেখানেই মাছির মতো রাজনীতিকদের ভনভনানি। ভারতীয় ক্রিকেটে এখন বিস্তর টাকার খেলা চলে। তাই মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নিয়ন্ত্রণ করে শরদ পাওয়ারের দল এন সি পি। কংগ্রেসের জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। কংগ্রেসের রাজীব শুক্লা বি সি সি আইয়ের অন্যতম বড়কর্তা। কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নিয়ন্ত্রণ করেন সেখানের ন্যাশানাল কনফারেন্স দলের প্রবীণ নেতা ফারুখ আবদুল্লা। প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এন শ্রীনিবাসন তামিলনাড়ুর ডিএমকে দলের সঙ্গে যুক্ত। রাজস্থানের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের প্রত্যক্ষ মদতে একদা ললিত মোদী ছিলেন রাজস্থান ক্রিকেটের একনম্বর কর্তা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি দিল্লী রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রধান পেট্রন। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কর্তা হিসাবে এইসব রাজনীতিকরাই একযোগে বিসিসিআইকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এখানে কংগ্রেস-বিজেপি- জনতাদল সবাই ভাই ভাই। বিসিসিআইয়ের বিপুল অঙ্কের তহবিল দখলে রাখাটাই রাজনৈতিক নেতাদের মূল লক্ষ্য। তাঁরা কেউ কোনোদিনই ক্রিকেট খেলেননি। দক্ষ প্রশাসকও নন। তাঁরা যেটা জানেন তা হচ্ছে টাকার খেলা।

ললিত মোদীর অপরাধ, তিনি তাঁর সহযোগী রাজনীতিক কর্তাদের অন্ধকারে রেখে আইপিএলের বখরার টাকাটা একাই আত্মসাৎ করে ইংল্যান্ডে পালিয়েছেন। তাই ললিত মোদীর বিরুদ্ধে বিসিসিআইয়ের কংগ্রেস বিজেপি জনতা দল ন্যাশানাল কনফারেন্স দলের নেতারা ক্ষিপ্ত। সুষমা স্বরাজ, বসুন্ধরা রাজে ললিত মোদীকে সাহায্য করে সব দলেরই নেতাদের রোষানলে পড়েছেন। এটা আদতে বখরার লড়াই। ললিত মোদী বৃটেনে আশ্রয় নেওয়ার পর বিসিসিআই দুই সদস্যের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি গড়ে। এই দুই সদস্য হলেন বিজেপির অরুণ জেটলি এবং কংগ্রেসের জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। দুই সদস্যই একমত হন যে ললিত মোদী বিসিসিআইয়ের বিপুল অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ললিত মোদী ব্যক্তিগতভাবে বিজেপির নেতা হলেও অরুণ জেটলি তাঁর সমর্থনে একটি বাক্যও খরচ করেননি। উল্টে শাস্তির সুপারিশ করেছিলেন। তাছাড়াও একটা প্রশ্ন থাকছে। সুষমা স্বরাজ যে ললিত মোদীর ভিসার জন্য বৃটিশ সরকারকে ব্যক্তিগতভাবে সুপারিশ করেছিলেন সেই গোপন খবরটি বিদেশ দপ্তর থেকে কীভাবে ফাঁস হলো। তবে কী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মধ্যেই ঘরভেদী শত্রু লুকিয়ে আছে।

তাই বলছি, সুষমা স্বরাজ নয় মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের বন্দুকের আসল লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদী। মোদীজীর ভাবমূর্তি নষ্ট করলে বিহারের নির্বাচনে বিজেপি জোর ধাক্কা খাবে।

পার্টিগনিতের যোগ-বিয়োগ

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা

আজ যোগদিবসের সন্ধ্যায় বসে এই চিঠি লিখছি। আপনাদেরই লিখছি, কারণ, এটা সকলেরই জানা তবু সকলেরই জানা দরকার। ভারতের এক প্রাচীন পরম্পরা যোগ। কিন্তু আরও অন্যকিছুর মতো এই ভারতীয়ত্বও ভারতে একটা বড় সংখ্যক মানুষের কাছে ব্রাত্য। কারণ, এতে হিন্দুত্বের গন্ধ আছে। কী মুশকিল বলুন তো, হিন্দুধর্মের মধ্যে যুক্ত এত ভালো জিনিস থাকলে তো মুশকিল। সেগুলো সবই ব্রাত্য করে দিলে যে অনেক কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। গোটা পৃথিবী কিন্তু ধর্মীয় গোড়ামি না দেখিয়ে সনাতন ভারতীয় ভালো জিনিসকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। মানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু করেছে। যেমন যোগ আজ বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশেই জনপ্রিয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে। কারণ আধুনিক বিশ্বে যেসব অসুখ মহামারীর আকার নিচ্ছে তার নিদান লুকিয়ে আছে ওই যোগাভ্যাসের মধ্যেই। টেনশন নামক মহামারীরও তো একটাই ওষুধ।

কিন্তু দেশটার নাম যখন ভারত তখন যোগের অবস্থা ঠিক 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' অবস্থা। যোগগুরুরা কমবেশি সকলেই উপহাসের পাত্র। অথচ সেই যোগকে কেন্দ্র করেই আজ আবার ভারত শ্রেষ্ঠ আসনের দাবিদার হলো নতুন করে। সৌজন্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। অনেকেই তাঁকে 'যোগগুরু মোদী' বলে কটাক্ষ করেছেন। তবে সেটা কিন্তু সত্যি সত্যিই বলা যায়।

দিল্লীর রাজপথে ২১ জুন ভারতীয়ত্বের উৎসব দেখল গোটা পৃথিবী। ভারতের উদ্যোগে রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মতি আদায়ের পর দিল্লীর রাজপথ থেকে নিউ ইয়র্কের টাইমস্ স্কোয়ার— সর্বত্র জুড়ে রইলেন নরেন্দ্র মোদী। অনেক বিতর্কের কাঁটা সহ্য করেও গোটা বিশ্বকে ভারতীয়ত্বের 'যোগ' সূত্রে বেঁধে দিলেন তিনি। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ অধিবেশনে তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সমর্থন করেছিল ১৭৭টি দেশ। আজ রাষ্ট্রপুঞ্জে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজও বলেন, 'যোগের কোনো ধর্ম নেই। সারা পৃথিবীকে একসূত্রে বাঁধতে পারে এই যোগ। যোগের অর্থই হলো মিলন, বন্ধন। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারত সারা বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে যোগেরই সাহায্যে। আশা করি, যোগ ব্যবহার করে রাষ্ট্রপুঞ্জ সারা পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেবে।'

মোদীর কথায়, "সূর্যের প্রথম আলো যেখানে পড়েছে, সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টায় শেষ আলো যেখানে পড়বে, এই গোটা যাত্রাপথে এমন কোনো স্থান থাকবে না, যেখানে যোগ অভ্যাসীদের আশীর্বাদ করার সুযোগ থাকবে না। গোটা বিশ্বকে সে কথা স্বীকার করতে হবে।"

দিল্লীর ছবিটা যখন এই রকম তখন গোটা দেশে সারাদিন আতঙ্কে কাটালে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস। আগে থেকেই কংগ্রেসের একটা লক্ষ্য ছিল যে ভারত নয়, এই ক্ষেত্রেও গান্ধী পরিবারের স্তুতি করতেই হবে। সেজন্য যোগ ভারতের নয়, নরেন্দ্র মোদীর নয়, এটা গান্ধী পরিবারের প্রমাণ করতে অনেক চেষ্টা হয়েছে। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধীর যোগাভ্যাসের নিদর্শন তুলে ধরে তারা মোদীর কৃতিত্ব কমাতে চেয়েছেন। আর যোগ দিবস বয়কট করেছেন। বেশ তো যোগ মোদীর সম্পত্তি নয়, তাদের পূজ্য গান্ধী পরিবারের ভেবেও তো তাতে অংশ নেওয়া যেত। তাছাড়া নরেন্দ্র মোদীর আগে গোটা বিশ্বের কাছে ভারতীয় যোগকে তুলে ধরার চেষ্টা তো আর হয়নি গান্ধী পরিবারের দীর্ঘ শাসনে। যাই হোক সোনিয়া, রাহুলরা অনুপস্থিত যোগ উৎসবে। আর গোটা বিশ্ব দেখল ভারতীয়ত্বকে মেনে নেওয়ায় দ্বিধা ভারতেই বেশি। তবে ঠিকই করেছেন রাহুল গান্ধীরা। যোগ দিবস তো একদিনের, রাজনীতিটা ৩৬৫ দিনের।

আর বামেদের কথা বাদই দেওয়া যেতে পারে। কারণ, এটা ভিয়েতনামের উদ্যোগ হলে তারা অবশ্যই লোকাল কমিটি থেকে পলিটব্যুরোর বুড়ো, সরি বৃদ্ধদেরও সামিল করতেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের যুক্তি অবশ্য আলাদা। মুসলমান ভোট নিয়ে সর্বদা আতঙ্কে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের জেনে রাখা ভালো ৪৭টি মুসলমান রাষ্ট্রও ভারতের সঙ্গে সরকারিভাবে এই উৎসবের কো-স্পনসর হয়েছে। যার মধ্যে আছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ওমান, কাতারের মতো দেশ। অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক কো-অপারেশন -এর (ও আই সি) আটটি দেশ এই উৎসবে সামিল হতে চায়নি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৌদি আরব, মালয়েশিয়া এবং পাকিস্তান। পাকিস্তানের ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যায়, ভারত মানেই শত্রু এটা ওদেশের মানসিকতায়, মজ্জায়। তাই তো অরাজি পাকিস্তানকে বাদ দিয়েই সার্ক দেশগুলির মধ্যে সড়ক পথে পণ্যপরিবহণ চূড়ান্ত করে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কিন্তু মাননীয় ভারতীয় রাজনীতিকরা কী ঠিক করলেন? অবশ্যই ঠিক করেছেন। কারণ, যোগ দিবস একদিনের, পার্টিগণিতের যোগ-বিয়োগ ৩৬৫ দিনের।

—সুন্দর মৌলিক

বিশ্বব্যাপী ইসলামি সন্ত্রাসের ধারায় পশ্চিমবঙ্গেও জঙ্গি ইসলামি উত্থান এবং বিপন্ন জাতীয়তা ভাবনা

দেবব্রত ঘোষ

মাসখানেক আগে বীরভূমের সাত্তোরে তৃণমূল কর্মী শেখ কানু (যিনি একাধিক খুনের মামলায় দাগি আসামি এবং পুলিশের খাতায় ফেরার) প্রকাশ্য দিবালোকে, পুলিশ ফাঁড়ির সামনেই একাধিক পুলিশ কর্মীর সামনে সাংবাদিক নিগ্রহ করেছেন এবং এবিপি আনন্দ টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক রাজর্ষি দত্তগুপ্তকে হুমকি দিয়ে বলেছেন 'হাজার পুলিশ এলেও আমার হাত থেকে আপনাদের বাঁচাতে পারবে না, আমি তৃণমূল করি। আমি আপনার হাত-পা কেটে রেখে দেবো।' এই সংবাদ অডিও ভিস্যুয়াল টেলিকাস্ট করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এটাকে মিডিয়ার সাজানো তত্ত্ব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন যেমন ভাবে কলকাতার গাঙ্গুলিবাগানে পুলিশের সামনে মিডিয়ার সাংবাদিককে (এবিপি আনন্দ) মাটিতে ফেলে যখন তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী বেদম পেটাচ্ছিল তখনও মুখ্যমন্ত্রী তাকে সাজানো ঘটনা বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পেটোয়া মিডিয়া চ্যানেল ও সংবাদমাধ্যম (খবর ৩৬৫ দিন) বলছে 'বাংলায় পরিপূর্ণ শান্তি ও উন্নয়ন চলছে, প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদমাধ্যম মমতাকে হেয় করার জন্য সাজানো চক্রান্ত করছে।' আমি স্বস্তিকা পত্রিকা নিয়ে বাসে বসে পড়ছিলাম বলে আমাকেও হেনস্থা হতে হয়েছে কিছুদিন আগে। এই মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কি জনগণ নিরাপদ?

রাজনৈতিক ও দলতান্ত্রিক স্বজনপোষণ সমাজজীবনকে যেমন পঙ্গু করে দেয় তেমনি প্রশাসনকেও দুর্বল করে দেয়। তখন দুর্বল প্রশাসনের ভেতর ক্ষতিকারক উপাদান ঢুকে যায় যা দেশে ও জাতির পক্ষে চরম বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। সন্ত্রাসবাদ বা উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ এই সুযোগটাই খোঁজে। আমাদের রাজ্যে ঠিক এই জিনিসটাই ঘটে চলেছে।

একটা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন বা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঠিক চেহারা দেখতে গেলে গোটা রাজ্য ঘুরে না বেড়ালেও চলে, শুধু কিছু আঞ্চলিক ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রাজ্যবাসী কেমন

আছে। বর্ধমানের খাগড়াগড়ের পর মেদিনীপুরের পিংলা। পিংলায় বোমা ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানাকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ওটা নাকি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বাজির কারখানা। এটা তাঁর অজ্ঞানতা কিংবা মিথ্যাভাষণ অথবা দুটোই। কারণ তিনি তাঁর দলীয় তোষামুদে নেতা-কর্মীদের রিপোর্ট ছাড়া আর কিছুই মানতে চান না। বাঁকুড়াতেও গাড়ির মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে এবং কাউকেই গ্রেপ্তার করা যায়নি। এ ধরনের ঘটনা আমরা আজকাল আকছার দেখছি রাজ্য জুড়ে। পুলিশ স্যালুট করছে তৃণমূলী খুনি গুণ্ডাকে এ দৃশ্য আমরা মমতা-আমলেই দেখলাম। এ রাজ্যে ইসলামি মৌলবাদ ঘাঁটি গাড়বে না তো কোথায় গাড়বে?

উন্নয়ন হলে রাজনৈতিক বা সামাজিক সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিতে পারে না। প্রসাসন দক্ষ, শক্তিশালী হলে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ বা মৌলবাদ মাথা চাড়া দিতে পারে না। আমাদের রাজ্যে ইসলামি মৌলবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তার একটা কারণ শাসকদলের সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি। দ্বিতীয় কারণ, জি-হুজুর মার্কা অপদার্থ পুলিশ প্রশাসনে দক্ষ লোকের অভাব। তৃতীয় কারণ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিনা প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনীয় খাতে মুক্তহস্তে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন সস্তা জনপ্রিয়তার পাবার মোহে, যার ফলে উন্নয়নে বরাদ্দ করার মতো অর্থ সরকারি কোষাগারে থাকে না। এই অনুন্নয়ন ডেকে এনেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও লালন করছে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদকে।

পশ্চিমবাংলায় নতুন ইসলামি জঙ্গি সংগঠন ও তালিবানি ফতোয়া : কায়দার আল জেহাদ নামে একটা নতুন ইসলামি জঙ্গি সংগঠন পশ্চিমবাংলায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির সন্ত্রাসবাদীরা এই নতুন জঙ্গিগোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় তার শাখা বিস্তার করে চলেছে বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়ায়। এদের সাথে হাত মিলিয়েছে আহলা হাদিস ও হিজাফত-ই-ইসলামের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোও। কুখ্যাত জঙ্গি মাসুদ আজহার এদের অন্যতম মাথা। আমাদের রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে আছে। রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলা মুর্শিদাবাদ মুসলমান অধ্যুষিত। সেখানে অনুপ্রবেশজনিত কারণে হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে এবং দ্রুতগতিতে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেআইনি মাদ্রাসা। মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার। তালিবানি শাসন চলছে মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গ্রামে। সরস্বতীপুজো-সহ অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর পুজো বন্ধ করতে হবে, মন্দিরে অনুষ্ঠান করা

যাবে না, বাড়িতে আলপনা দেওয়া চলবে না এমন তালিবানি ফতোয়া দেওয়া চালু হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গ্রামে। বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেছেন রমাপ্রসাদ সরকার এবং তিনিও হুমকির মুখে পড়েছেন। আমাদের রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ (পড়ুন সংখ্যালঘু তোষণকারী) সরকার তথা প্রশাসন তথা একচ্ছত্র সর্বাধিনায়িকা মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার।

নতুন করে ইসলামি সন্ত্রাস : আমাদের রাজ্য আজ বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে। সামনে ইসলামি মৌলবাদের ক্রমবর্ধমান ভ্রুকুটি। ইসলামিক স্টেট (আই এস) ছাড়াও হরকত-উল- জিহাদি-ইসলামি (হুজা), হিজবুল মুজাহিদিন, লস্কর-ই-তোইবা, জামাত-উল- মুজাহিদিন (জুম), আনসার-উল-তউহিদ, সুন্নতুল জামাত, মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়ন, আসিকান রসুল কমিটি, মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদ, অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিল, মুসলিম মজলিসে মুসাওয়ারত, আমিনিয়া জমিয়তে মুত্তাকিন, বাংলা সংখ্যালঘু কাউন্সিলের মতো অনেক ইসলামি সংগঠন বৃহত্তম ভারতভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে যাদের একমাত্র লক্ষ্য গোটা দুনিয়ার ইসলামিকরণ। এই উগ্র ধর্মান্ধ মুসলমান মৌলবাদ ভারতের কাছে আজ এক জ্বলন্ত সমস্যা শুধু নয়, বলা যায় সবচাইতে প্রধান মানবিক সংকট যা আমাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই বিপন্ন করছে। শুধু তাই নয়, দেশের ভৌগোলিক বিপন্নতাকেও ডেকে আনছে। আমাদের রাজ্যের বর্তমান ক্ষমতাসীন একদলীয় গণতন্ত্রের সরকার তোষণের নামে মৌলবাদী ইসলামি আগ্রাসন সম্পর্কে মূক, বধির ও অন্ধ হয়ে রয়েছে। সারা ইউরোপ ও আমেরিকা আজ নৃশংস ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। এমনকী কট্টর ইসলামি দেশগুলোর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাও আজ আগ্রাসী উগ্র ধর্মান্ধ ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

কিন্তু আমাদের রাজ্য পশ্চিমবাংলা? মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা তার দলীয় মুখপত্র বা মুখপাত্রের দল কেউই ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে একটাও কথা উচ্চারণ করলেন না। কারণটা স্পষ্ট। যদি মুসলমান ভোট কমে যায়? তাহলে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধরেই নিয়েছেন এ রাজ্যের সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায় গোটা দুনিয়ার ইসলামিকরণের পক্ষপাতী। যদি এটাই তাঁর বিশ্বাস তবে তাদের তিনি তোষণ করেন কেন? এখানেও উত্তর একটাই। গদির মোহ যা সিপিএমের ছিলো, কংগ্রেসের ছিলো এবং তাঁরও রয়েছে এবং আরো অধিক মাত্রায় রয়েছে, কারণ এতোটা ব্যাপক, বল্গাহীন, লজ্জাহীন সংখ্যালঘু তোষণ আমরা পূর্ববর্তী জামানতে এতোটা প্রকাশ্যভাবে দেখিনি। আই এস জঙ্গিগোষ্ঠী আমাদের রাজ্যেও সক্রিয় হতে চলেছে— সৌজন্যে আমাদের রাজ্যের শাসকদল। মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার। এ রাজ্যে ইসলামি মৌলবাদ ঘাঁটি গাড়বে না তো কোথায় গাড়বে?

এ কোন্ আত্মঘাতী উন্নয়ন? কলকাতা বণিক সভায় পশ্চিমবাংলার অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানালেন, রাজ্য সরকার ২ লক্ষের বেশি সংখ্যালঘু ছাত্রীকে বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করেছে। এছাড়া রাজ্য সরকার কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৯০ কোটি টাকা এবং মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ বাবদ ৯৯১ কোটি টাকা খরচ করেছে। এ রাজ্যে অসংখ্য হিন্দু ছাত্রছাত্রী রয়েছে যাদের পরিবার আর্থিকভাবে দারিদ্র্যসীমার নীচে এবং এইসব ছাত্রছাত্রীর অনেকেই অত্যন্ত মেধাবী, কিন্তু তারা রাজ্য সরকারের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত— তাদের একটাই অপরাধ বা অযোগ্যতা যে তারা হিন্দু সমাজের মানুষ। তাহলে এটাই বুঝে নিতে হবে এ রাজ্যটা এখন শুধুই সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য এবং শুধুমাত্র সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষদের উন্নয়ন করাটাই রাজ্য সরকারের একমাত্র কিংবা প্রধানতম ব্রত। এটা তো পক্ষপাতদুষ্ট বিভাজনের রাজনীতি ও মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচার। এ রাজ্যে ইসলামি ঘাঁটি গাড়বে না তো কোথায় গাড়বে?

যাদবপুরে বেশ কিছুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি সরিয়ে চে-গুয়েভারার মূর্তি বসানোর দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করেছিল। তখন কী সিপিএম, কী কংগ্রেস, কেউই একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। সলমন রুশদি বা তসলিমা নাসরিন যখন ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু সত্যি কথা লিখলেন তখন তাঁদের প্রাণনাশের দাবিতে মুসলমানরা একত্রিত হয়েছিল এবং আমাদের দেশের প্রগতিশীল হিন্দুরাও তসলিমা বিতাড়নে নেমেছিলেন। এখানেও সিপিএম, কংগ্রেস জোটবদ্ধ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কথাও বলেননি। সেদিনও না, পরেও না। মমতার সঙ্কীর্ণ রাজনীতি বাংলায় ইসলামি মৌলবাদকে লালন করে চলেছে এক অনিয়ন্ত্রিত টানে এবং ডেকে আনছে বাংলার আকাশে এক ধ্বংসলীলার অমানিশা। এ রাজ্যে ইসলামি মৌলবাদ ঘাঁটি গাড়বে না তো কোথায় গাড়বে?

পশ্চিমবাংলার সর্বত্র বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ক্রমশ বেড়ে চলা ইসলামি মৌলবাদ কিন্তু বাস্তবে ইউরোপ-আমেরিকা-সহ পৃথিবী জুড়ে দ্রুত বেড়ে চলা ইসলামি মৌলবাদেরই একটা অংশ। আমাদের রাজ্যে বেড়ে চলা ইসলামি মৌলবাদ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটা বিশ্বব্যাপী ইসলামি মৌলবাদেরই একটা শাখা মাত্র। একে উপেক্ষা করলে রাজ্যের সর্বনাশ এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সর্বনাশের পথেই হাঁটছেন।

সৎ, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী পুলিশ প্রশাসন এবং গোয়েন্দা বিভাগ যে-কোনো রাজ্যের সম্পদ এবং তাদের যদি অপরাধ দমনে ও অপরাধী গ্রেপ্তারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, কোনো সম্প্রদায় বিশেষকে যদি তোষণ না করা হয় তাহলে ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, পারলেও সেটা সাময়িক। আমাদের দরকার জাতীয় ভাবনা এবং সেটা সত্যিকারের জাতীয় ভাবনা।

আমরা ভারতীয় এটাই আমাদের সবচাইতে বড় পরিচয়। যেটা আছে বলেই ইউরোপ বা আমেরিকা, এমনকী ক্ষুদ্র দেশ ইজরায়েলও ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারছে, সন্ত্রাসবাদীরা সাজাও পাচ্ছে। সেটা নেই বলেই আমাদের রাজ্যে ইসলামি মৌলবাদীদের এতো রমরমা।■

বিদেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতে সন্ত্রাস ঘটালে তাৎক্ষণিক যোগ্য জবাব মিলবেই

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত)

ভারত সরকার এন এস সি এন (আই এম) এবং এন এস সি এন (খাপলাং) গোষ্ঠী দুটির সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিল। এই শান্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ তাদের দাবি ছিল নাগাল্যান্ডের চারিপাশে অন্য রাজ্যে যেখানে নাগা বসতি আছে, সেই অঞ্চলগুলি নাগাল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। অন্য কোনো রাজ্যই তাদের রাজ্যের ভূখণ্ড ছাড়তে নারাজ। যেমন মণিপুরের নাগা অধ্যুষিত উখরুল জেলা।

কিছুদিন আগে খাপলাং ভারত সরকারের শান্তিচুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন এবং এক নতুন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সংগঠন গড়েছেন। যে গোষ্ঠীতে বোরো, কামতাপুরি, উলফা

'হট প্যারাসুট'-এ অংশগ্রহণকারী বাহিনী।

(পরেশ বড়ুয়া) এবং মণিপুরের কে এল কে, পি এন এ ইত্যাদি এক ছাতার তলায় এসেছে। নতুন সংগঠনের নাম ইউনাইটেড লেবারেশন ফ্রন্ট অফ ওয়েস্টার্ন গ্রাউন্ড ইস্ট এশিয়া। নেতৃত্বে স্বয়ং খাপলাং। কামতাপুরি (কে এল ও) দলের জীবন সিংও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে রয়েছেন উলফার পরেশ বড়ুয়া।

এই সংগঠন একটা বড়সড় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করার প্রয়াস করছিল। এরা আশ্রয় নিয়েছিল নাগাল্যান্ড-মণিপুর সংলগ্ন মায়ানমার ভূখণ্ডে।

ভারত সরকার আগে বহুবার মায়ানমার সরকারকে অনুরোধ করেছিল তাদের ভূখণ্ড থেকে ভারতবিরোধী ওই সন্ত্রাসবাদীদের বিতাড়িত করতে। মায়ানমারের সামরিক কর্তৃত্ব জানিয়েছিল, তাদের নিজেদের সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতেই তাঁরা ব্যস্ত। ভারতবৈরীদের তাড়াবার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা খাপলাং গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছিলেন। এমতাবস্থায় মায়ানমার সরকার এই সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, আশা করাই বৃথা। তার উপর খাপলাং নিজে মায়ানমারের নাগরিক।

তাদের সামনে সুযোগ এসে গেল। ডোগরা ব্যাটালিয়ন ৪ জুন চ্যান্ডেল থেকে রওনা হয়ে মণিপুরের বাইরে চলে যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য যখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল তখন নিশ্চয়ই তাদের কিছুটা ঢিলেমি ছিল। রোড অপেনিং দল রাস্তা সার্চ করে রাস্তার ধারের উঁচু জমি অধিকার করে (ট্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ড) রাস্তায় চলমান ট্রাকগুলিকে কোনো বৈরী আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার কাজটি ঠিকভাবে হয়নি। ফলে ২০ জন জওয়ান প্রাণ হারালেন। সন্ত্রাসবাদীদের একজনও হতাহত হয়নি। তারা গাড়ির মধ্যে বসে থাকা সৈনিকদের হত্যা করে মায়ানমারে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলো। রাস্তার ধারে কোনো গ্রামে লুকিয়ে থেকে, ঠিক 'এম্বুস' করার সময় রাস্তায় এসে গুলি ছুঁড়ে, গ্রেনেড ছুঁড়ে সৈনিকদের হত্যা করে, আবার গ্রামের মধ্য দিয়েই সীমান্ত পার করে চলে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু গ্রামের দিকে গুলি চালানো সৈনিকদের পক্ষে সহজ ছিল না, বহু সাধারণ নাগরিক হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উখরুলের পথে অন্তত চারবার 'এম্বুস' হওয়ার সুবাদে আমার এই অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এই অবস্থা চলতে পারে না, সন্ত্রাসবাদীদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সামরিক বাহিনী হেলিকপ্টারে প্যারা কম্যান্ডো বাহিনী ব্যবহার করে মায়ানমার ভূখণ্ডে দুটি সন্ত্রাসবাদী শিবির উড়িয়ে দিয়ে এসেছে মাত্র ৪৫ মিনিটের অপারেশনে। কম্যান্ডোদের সকলেই নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে এসেছেন। জানা যাচ্ছে, এই কম্যান্ডো অপারেশনে বেশ

কিছু সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে।

এর আগে বহু বছর ধরে সামরিক বাহিনী এমন ঝটিকা আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনুমতি আসেনি। কারণ ভারত সরকার শান্তির পথে আলোচনার মাধ্যমে অবস্থার মোকাবিলা করার প্রয়াসী ছিল। একমাত্র ১৯৭১-এর যুদ্ধে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এমন কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। মনে হয় এই প্রথমবার ভারত সরকার তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রদর্শন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। এবার হয়তো ভারতের 'দুর্বল রাষ্ট্র'-র তকমা ঘুচবে।

সামরিক বাহিনীর এই সাফল্যের পর বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, ভারত তার পশ্চিম সীমান্তেও কি এমন ভাবে সামরিক শক্তির প্রয়োগ করবে? পাকিস্তান ভারতকে সাবধান করে দিয়েছে, পাকিস্তান মায়ানমার নয়, উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য তারাও প্রস্তুত। আমাদের উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন— 'বিদেশি সন্ত্রাসবাদীরা ভারত ভুখণ্ডে প্রবেশ করে ভারতবাসীর রক্তক্ষরণ করলে, তা আর বরদাস্ত করা হবে না, উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।' ভারত আগ্রাসী রাষ্ট্র নয়। অন্য কোনো রাষ্ট্রের ভুখণ্ডের উপর ভারতের কোনো লোভ নেই। সমস্যা থাকলে ভারত আলোচনার মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানে পক্ষপাতী। কিন্তু যখন কোনো কোনো রাষ্ট্র 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি'তে বিশ্বাসী, সেই ক্ষেত্রে 'হট পারসুট' একটা কার্যকরী ব্যবস্থা হতে পারে।

মায়ানমার সীমান্তে কোনো পক্ষের কোনো সীমান্তরক্ষাকারী সেনাবাহিনী নেই। অতএব কাজটা তেমন কঠিন নয়। পশ্চিম সীমান্ত সর্বদাই জ্বলন্ত। পাকিস্তান বিনা প্ররোচনায় অস্ত্র বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে প্রায়শই ভারতে সীমান্ত নিকটবর্তী গ্রামে গোলাগুলি বর্ষণ করে চলেছে। এখন ভারতের সেনাও জবাব দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানি জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা যদি আবার ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে বড় বড় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটায় ভারতীয় সামরিক বাহিনী তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত ও সদা প্রস্তুত। কৌশলও তাদের নখদর্পণে, যে কোনো সময়ই তারা উপযুক্ত জবাব দিতে পারবে। তবে হয়তো তার জন্য কম্যান্ডো বাহিনীকে কিছু রক্ত, কিছু প্রাণ বলিদান দিতে হবে। জম্মু-কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণরেখা আর একবার সীমান্ত যুদ্ধের রূপ নেবে। তার জন্য ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

অভিযানের মুহূর্তে প্যারা-কমাণ্ডো।

আশা করব, প্রতিবেশী রাষ্ট্র অনুধাবন করবে ভারতের সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। আর সন্ত্রাসবাদীদের নিজনিজ ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতে সন্ত্রাস ঘটাতে দেওয়া হবে না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। ■

এজেন্ট হওয়ার জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ৩০.০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের বকেয়া টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো যাবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমার টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

— ব্যবস্থাপক

অভিরূপ নাগচৌধুরী

কূটনীতি আর প্রতিরক্ষার মেলবন্ধন আমাদের দেশকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার সাম্প্রতিক নমুনা দেখা গেল মায়ানমারে। ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সম্পর্ক সহস্রাব্দ প্রাচীন। এককালে ভারতেই অঙ্গরাজ্য ছিল বর্মা। আজ আলাদা হয়ে যাবার পরেও দু'দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন অটুট রয়েছে। সেই ব্রহ্মদেশ বা বর্মা ওরফে মায়ানমার কিছুদিন আগে অবধিও চলে গিয়েছিল চীনের গ্রাসে। মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষা মণিপুর ও নাগাল্যান্ডে যাবতীয় সন্ত্রাসের নকশা সে দেশের মাটিতেই তৈরি হচ্ছিল। তাই এটা খুব জরুরি ছিল মায়ানমারের জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করা। গত ৮ জুন গভীর রাতে যখন প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার সেনা-অভিযান চললো মায়ানমারের ওনজায় এবং যার ফলে এন এস সি এন-খাপলাং গোষ্ঠীর দুটি জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে দেওয়া গেল তখন কি ভারতের সফল প্রতিরক্ষার পাশে কূটনৈতিক সাফল্যকেও কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায়? যে কূটনীতি দেখাল চীনের গ্রাস থেকে মায়ানমারকে বের করা সম্ভব এবং সেই কূটনৈতিক দৌত্যে অন্য দেশে ঢুকে ভারতীয় সেনা অভিযান চালাবার

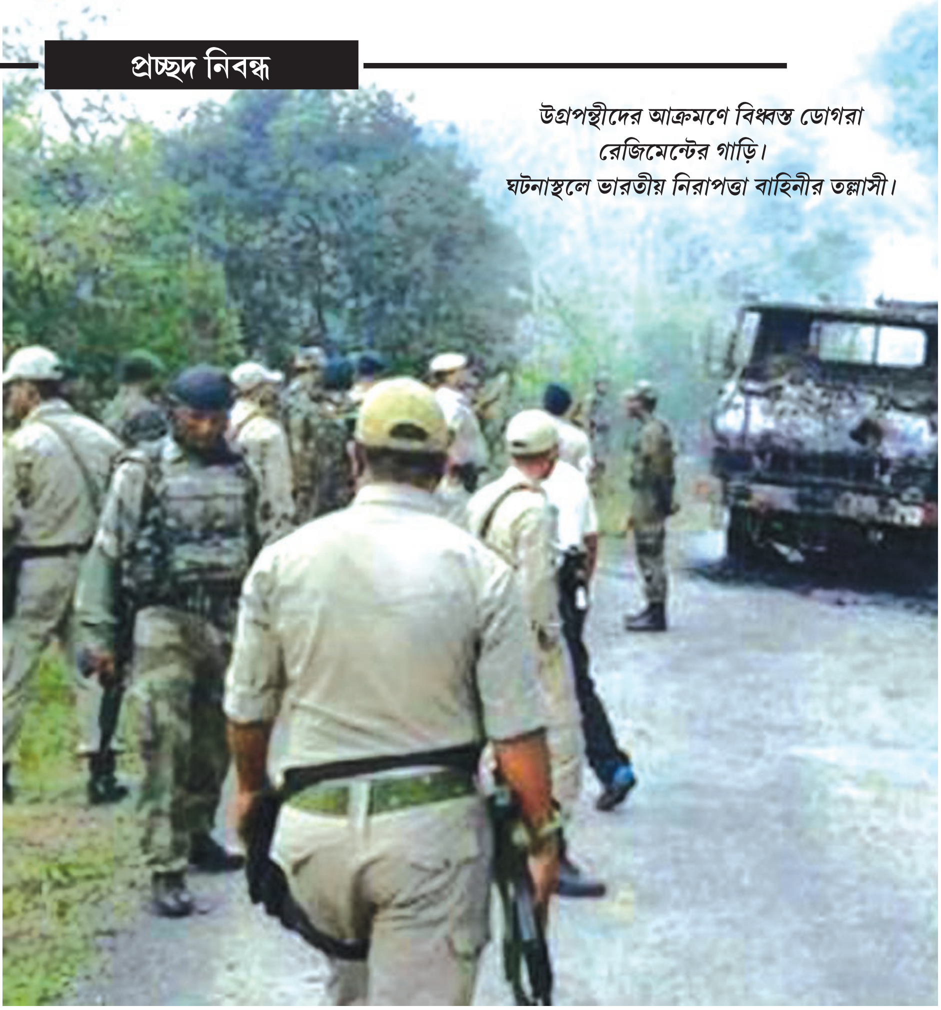

উগ্রপন্থীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত ডোগরা রেজিমেন্টের গাড়ি। ঘটনাস্থলে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাসী।

উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদ রুখতে পারলেই দেশের নিরাপত্তা সুসংহত হবে

পরও ভারত-বিরোধীদের হাজার প্ররোচনা সত্ত্বেও সেই দেশের পক্ষ থেকে কোনো জবরদস্ত প্রতিক্রিয়া আমরা পাইনি।

উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিস্থিতিটা গত মাস তিনেক ধরেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব ওয়েস্টার্ন সাউথ ইস্ট এশিয়া (ইউ এন এল এফ ডব্লিউ)-র ছাতার তলায় উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাকামী গোষ্ঠীগুলি একজোট হয়েছে। ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (ইন্ডিপেনডেন্ট), ন্যাশনালিস্ট সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (খাপলং), কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন এবং ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বোড়োল্যান্ড— এই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি একজোট হয়ে ইউ এন এল এফ ডব্লিউ-এর নামে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে সন্ত্রাস কায়েম করেছে। এমনকী গত ৪ জুন যে নৃশংস জঙ্গি হামলায় মণিপুরের ডোগরা রেজিমেন্টের ২০ জন সেনা প্রাণ হারালেন তার দায়ও এই নয়া সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি নিয়েছে। ইতিপূর্বে গত ৩ মে নাগাল্যান্ডের মন জেলায় জঙ্গি হামলায় সাত অসম রাইফেল জওয়ান ও এক আঞ্চলিক সেনা জওয়ানের নিহতের দায়ও স্বীকার করে নিয়েছে তারা। প্রসঙ্গত, এন এস সি এন (কে)-এর চেয়ারম্যান এস এস খাপলং যিনি একইসঙ্গে এই নয়া জঙ্গি মঞ্চ ইউ এন এল এফ ডব্লিউ-এরও চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেছেন তিনি কেন্দ্রের সঙ্গে অস্ত্রবিরতি চুক্তি তুলে নিয়েছেন সম্প্রতি। যদিও মায়ানমারের সঙ্গে 'সাসপেনশন অব অপারেশন' চুক্তি আপাতত বজায় রেখেছেনে তিনি।

গত ১৭ এপ্রিল মায়ানমারের তাগা অঞ্চলে ইউ এন এল এফ ডব্লিউ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই নয়া জঙ্গি মঞ্চটি তৈরি হওয়ার পেছনে চীনের পরিকল্পনা সক্রিয় ছিল বলেই মনে করছেন দেশের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ২০১১ সালের চীনের ইউনান প্রদেশের রুইলিতে

একটি বৈঠক আয়োজিত হয়। যাতে উপস্থিত ছিলেন উলফা নেতা পরেশ বড়ুয়া, এন এস সি এন (কে) নেতা খাপলং; এছাড়াও মেইতেই জঙ্গি সংগঠন, ইউনাইটেড ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউ এন এল এফ) এবং মণিপুরের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পি এল এ)-র নেতৃত্বও এতে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকের অব্যবহিত পরেই মেইতেই জঙ্গিরা 'করকম' নামে একটি ছাতা-সংগঠন চালু করে। যাতে কাংগলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি, কাঙলেই ইয়াওল কাননা লুপ, পিপলস রেভেলিউশানারি পার্টি অব্ কাংগলেইপাক (পি আর ই পি এ কে), প্রিপাক (প্রোগ্রেসিভ), রেভেলিউশনারি পিওপিলস ফ্রন্ট এবং ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ একছাতার তলায় মিলিত হতে পারে।

তখন থেকেই জঙ্গি-মঞ্চ তৈরির পরিকল্পনা আংশিক রূপ পায়। অসম, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের অন্তত ১১টি জঙ্গি সংগঠন অরুণাচল, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের সীমারেখা দ্বারা ঘেরা মায়ানমারের পশ্চিম অংশে তাদের শিবির স্থাপন করে। ইউ এন এল এফ ডব্লিউ হলো জঙ্গিদের এধরনের তৃতীয় ছাতা সংগঠন। ১৯৮৯ সালে ইন্ডো-বার্মা রেভেলিউশনারি ফ্রন্ট নামে একটি জঙ্গি সংগঠন চালু হয়েছিল। ইউ এন এল এফ, এন এস সি এন (কে), উলফা, বুকি ন্যাশনাল আর্মি-র লোকজন তো এতে ছিলই। সেইসঙ্গে মায়ানমার-কেন্দ্রিক জঙ্গি সংগঠন চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট-এর সক্রিয় সহযোগিতাও ছিল এর পেছনে। ১৯৯৫-এর মাঝামাঝি উলফা এবং এন এস সি এন (কে)-র উদ্যোগে গঠিত আরও একটি জঙ্গি মঞ্চ, নাম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব্ সেভেন সিস্টারস। উলফা-আই, এন ডি এফ বি-এস এবং অন্য জঙ্গি সংগঠনগুলি উত্তর-পূর্ব ভারতকে পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলে অভিহিত করে দেশের উত্তর-পূর্বাংশকে বিচ্ছিন্ন করার লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এর পেছনে চীনের মদতের ব্যাপারটি যে খুবই স্বাভাবিক তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই ভারত-বিরোধী জঙ্গি-কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রথম কার্যকরী মনোভাব নেওয়া হয় ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে, যখন সেনা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৩০টি জঙ্গি ঘাঁটিতে অভিযান সংঘটিত করে। এধরনের দীর্ঘমেয়াদি লড়াই শুধু শক্তপোক্ত প্রতিরক্ষা দিয়ে হয় না। চীন ও পাকিস্তান ভারতের স্বাভাবিক শত্রু। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো কবজা করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের দেশেও উগ্রপন্থার অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছে। অস্বীকার করে লাভ নেই এ কাজে তারা বহুক্ষেত্রেই সফল হয়েছে। শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে এই প্রতিকূল শক্তিকে জয় করা যায় না।

ভারতের সফল বিদেশনীতি যে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ককে যথেষ্ট উন্নততর করেছে তা না বললেও চলে। ফলে চীন-পাকিস্তান আজ ব্যাকফুটে চলে গেছে। তবে সামরিক শক্তিকেও একইসঙ্গে জোরদার করা খুব দরকার ছিল। সরকারের নরম মনোভাব যে সেনাকে শক্তিশালী করার পথে প্রধান অন্তরায় হতে পারে বিগত জমানায় তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। জমানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের আপোশহীন মনোভাব ও সেনার হাতে ক্ষমতায়নের সূত্রে দেশের সেনাবাহিনীও তাদের হারানো মনোবল ফিরে পেয়েছে। মায়ানমারে সাম্প্রতিক বিরলতম অভিযানে তারই প্রতিফলন দেখা গেল।

ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে মায়ানমারের কথা আলাদা করে উল্লেখ করতেই হবে। ওই দেশটির সরকারি সমর্থন পরোক্ষভাবে তো বটেই, এমনকী খানিক প্রত্যক্ষভাবেও উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে ছিল। নাগা-বিদ্রোহীদের সঙ্গে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাদের ওতপ্রোত যোগাযোগ ছিলই। মায়ানমারের সরকারি সহযোগিতায় এন এস সি এন (কে) প্রধান এস এস খাপলাংকে ইয়াঙ্গনের একটি হাসপাতালে উড়িয়ে আনা হয় বলে খবর পাওয়া যাচ্ছিল। অথচ সেই মায়ানমারের ভূমিতে ঢুকে অপারেশন চালাতে সেদেশের ন্যূনতম সাহায্যটুকুর প্রয়োজন ছিলই। এখানেই ভারতের সফল কূটনীতি। যে কূটনীতির বলে মায়ানমারে ঢুকে ভারত অভিযান চালালেও সেদেশের পক্ষ থেকে স্বাভিমান-জনিত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বরং ঘটনাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়। মাঝখান থেকে ফুঁসে ওঠে চীন আর পাকিস্তান। কারণ ভারতের এই জঙ্গি নির্মূল অভিযানে মায়ানমারের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, বরং তাদের লাভই, কিন্তু এতে যদি কারোর ঘা লেগে থাকে তাদের নাম পাকিস্তান ও চীন।

শুধু জঙ্গি-ডেরা ধ্বংসেই তাদের কর্তব্য শেষ করছে না ভারত। বিশেষভাবে বলতে হচ্ছে, বুক বাজানোর কোনো প্রয়াস সরকারি পক্ষে কিন্তু দেখানো হয়নি। যদিও বিষয়টির অনেক ক্ষেত্রেই অপব্যবহার হয়েছে। গত ১৭ জুন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং বিদেশসচিব এস জয়শঙ্কর মায়ানমারের সভাপতি থিন সেন-এর সঙ্গে রাজধানী নে পি তো-তে মিলিত হন। তাঁরা মায়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গেও লাগাতার নিরাপত্তা সহযোগিতা এবং ভারত-মায়ানমার সীমান্ত ও অন্যান্য ইস্যুতে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। সব মিলিয়ে স্পষ্ট বিদেশনীতি ও কৌশলী কূটনীতির মেলবন্ধনেই আগুয়ান ভারতবর্ষ। ■

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গিদের মোকাবিলায় নীতির পুনর্বিবেচনা করুক কেন্দ্র

জ্যোতিলাল চৌধুরী

গত ৪ জুন মণিপুরে চাণ্ডেল জেলার প্যারোলঙ গ্রামে সেনাবাহিনীর ৬ নং ডোগরা রেজিমেন্টের জওয়ানদের উপর উগ্রপন্থীদের আক্রমণ সরকার ও নিরাপত্তা বিভাগকে একটা নাড়া দিয়েছে। দিল্লীও এই ঘটনায় বিস্মিত এবং উদ্বিগ্ন। গত দু' দশকে এরকম নৃশংস আক্রমণ হয়নি।

একই সঙ্গে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব সাউথ ইস্ট এশিয়া (ইউ এন এল এফ ডব্লিউ)-র নেতৃত্বে ৬টি উগ্রপন্থীদের জোট নিয়েও সরকার উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। এই জোটের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি হলো এন এস সি এন (কে), পিপল লিবারেশন আর্মি (পি এল এ), ইউনাইটেড নেশন লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউ এন এল এফ), পিপলস রেভিলিউশনারি পার্টি অব কাংগালেইপাক (প্রিপাক), কাংগলেইপাক (kangleipak) কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি) এবং কে ওয়াই কে এল।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থীদের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহল মনে করে, ইউ এন এল এফ ডব্লিউ নেতৃত্বাধীন জোট এই অঞ্চলের বিদ্রোহমূলক কাজকর্মে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির এইরকম জোট গঠন এই প্রথম নয়। আক্রমণাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে চায় মাত্র।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ইউ এন এস এফ, এন এস সি এন (কে) এবং ইউ এন এফ-এর সঙ্গে ১৯৯০-এর ২২ মে ইন্দো-বার্মা রেভিলিউশনারি ফ্রন্ট (আই বি আর এফ) জোট বেঁধেছিল। ইউ এন এল এফ, এন এস সি এল (কে) এবং উলফার পক্ষে সানা ওয়াইমা, এস এস খাপলং ও অরবিন্দ রাজখোয়া তখন যৌথ বিবৃতিতে দাবি করেছিল, ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত থেকে মুক্তির জন্য লিবারেশন অফ ইন্দো-বার্মা রিজিয়নের পক্ষে তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে এটা কথার কথাই থেকে গেছে।

১৯৯৫ সালেও উলফা এবং এন এস সি এন ইউনাইটেড লিবারেশান ফ্রন্ট অফ সেভেন সিস্টার (ইউ এন এফ এস এস) মিলে একটা জোট গঠন করে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের কারণে উলফা এই জোট থেকে বেরিয়ে আসে। যার ফলে এই ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। নীতি ও কৌশলের প্রশ্নে অরবিন্দ রাজখোয়ার সঙ্গে উলফার কমান্ডার ইন চীফ পরেশ বড়ুয়ার মতানৈক্য এই জোটের ভাঙন ডেকে আনে। দিল্লীর সঙ্গে রাজখোওয়ার নরম নীতির পরিবর্তে আক্রমণাত্মক ও গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই দরকার বলে পরেশ বড়ুয়া মনে করে। অন্যদিকে এন এস সি এন আবার আইজ্যাক-মুইভা ও খাপলং— এই দুই গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়।

ইউ এন এফ এন এস জোটের মতো মণিপুরের মেইতেই (Meitei) উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিও মণিপুর পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট (এন পি এল এফ) নামে এক ছাতার তলায় জোট বাঁধে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, লুটের টাকার ভাগ নিয়ে বিবাদ এবং এলাকা দখলের রাজনীতির কারণে এই জোট ও শেষপর্যন্ত টেকেনি। এম পি এল এফ খবরের কাগজে শিরোনামে এলেও তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এখন পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কে এল ও) এবং এন ডি এফ বি-র আলোচনা-বিরোধী একটা অংশ এস এস খাপলং নেতৃত্বাধীন এন ডি এফ বি-তে যোগ দিতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থীদের নতুন জোট ইউ এন এল এফ ডব্লিউ কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে ওয়াকিবহাল মহল সন্দেহ প্রকাশ করেছে। যদিও এরাই চান্ডেলে সেনাবাহিনীর কনভয়ের উপর আক্রমণের দায় স্বীকার করে নিয়েছে। এইসব উগ্রপন্থীদের গতিবিধির উপর যেসব গোয়েন্দা এজেন্সি নজরদারি চালিয়ে থাকে তাদের বক্তব্য হলো উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিতর্ক আগের মতোই রয়েছে। এর জন্য একে অন্য গোষ্ঠীকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে না।

পরেশ বড়ুয়ার একটি বিবৃতি তুলে ধরে গোয়েন্দা এজেন্সি ইঙ্গিতে বলতে চাইছে যে যুদ্ধবিরতির সমর্থক নয় এমন গোষ্ঠীগুলি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা পরিকল্পনা করছে। গোষ্ঠীগুলির এই ভাবনা তাদের হতাশারই প্রকাশ। কেননা তাদের এখন আর আদর্শগত কোনো ভিত্তি নেই এবং কার্যত জনসাধারণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের সমর্থক গোষ্ঠীর একটা বড় অংশই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশ নিচ্ছে। ফলে তাদের এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। শুধু তাই নয়, সার্বভৌমত্বের দাবি নিয়েও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। দ্বন্দ্ব রয়েছে নিজেদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও অহঙ্কার নিয়েও।

উগ্রপন্থীদের এই আক্রমণকে গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা বা বৈদ্যুতিন চ্যানেলে ডোগরা রেজিমেন্টের যাতায়াতের প্রদর্শনকে তাই দায়ী করা ঠিক হবে না। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করার জন্য বর্তমান নীতির পর্যালোচনা ও প্রত্যাঘাতের কৌশল নিয়ে কেন্দ্র সরকারের নতুন করে ভাবনার সময় এসেছে। মায়নমারের জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গিদের গোপন আস্তানাগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য ভারত-মায়নমার যৌথভাবে অভিযানের বিষয়টিও এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ∎

চিঠিপত্র

সোমনাথ মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। সোমনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন নিরাপত্তার পাশাপাশি পবিত্রতার দিকটি মাথায় রেখে এই নির্দেশিকা জারি হয়েছে। যদিও এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান। তিনি দাবি করলেন জাত ও ধর্মের উপর ভিত্তি করে ভেদাভেদ হবে না।

ভারতবর্ষের একটি অন্যতম সমস্যা ধর্মনিরপেক্ষতা। বহুত্ববাদের দোহাই দিয়ে ভাবের ঘরে চুরি আর কতদিন চলবে। মক্কা শহরে অন্য ধর্মের মানুষের প্রবেশাধিকার না থাকলেও তা আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হবে না।

সারাবিশ্বে ইসলামি জিহাদ এই মুহূর্তে ভয়ঙ্করতম বিপদ। ইসলামি ওয়াহাবি সালাফি সুন্নি জিহাদ আজ সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত। আইসিস ফরাসি ব্যঙ্গ পত্রিকা শার্লি এবদো পত্রিকা অফিসে বর্বর জিহাদি অভিযান চালিয়ে সাংবাদিকদের হত্যা করেছে, ইরাক সিরিয়াতে শিয়া মুসলমান, খৃষ্টান, কুর্দ, ইয়েজেদিদের হত্যা করেছে, বিদেশি সাংবাদিকদের কাটা মুণ্ডুর প্রদর্শনী করেছে, শত শত কিশোরীকে যৌনদাসীতে পরিণত করেছে, ধর্মের নামে ব্যাবিলনীয় এবং আসিরিয় সভ্যতার স্থাপত্য এবং টিউনিশিয়ার জাদুঘরের প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু বর্বরোচিত ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কোনো বিলাপ শোনা যায় না। গির-সোমনাথ জেলার প্রাচীন এই শিবমন্দিরে পুনরায় যে আক্রমণ হবে না এই নিশ্চয়তা কোথায়? সম্ভবত এই কারণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই সতর্কতা অবলম্বন।

ভুলে গেলে চলবে না যে সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছে এবং ভেঙে তছনছ করেছে। এজন্য সে দুঃখিত বা লজ্জিত নয়, বরং এই অপকর্মকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়েছে। যতবারই মন্দিরটি ধূলিসাৎ হয়েছে ততবারই মন্দিরটি নতুন করে গড়ে উঠেছে। আধুনিক যুগের সুলতান মামুদদের আটকানোর জন্যই এই নির্দেশ নামা। হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষেরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় অনুমতি সাপেক্ষে সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন। সুতরাং মন্দিরে প্রবেশ সংক্রান্ত এই নিষেধাজ্ঞা ধর্মীয় ভেদাভেদকে উৎসাহিত করবে এমনটা দাবি করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

—**অনু বর্মণ,**
মদনপুর, নদীয়া।

ফরজানা আলম

সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব ডেপুটি মেয়র তরুণী-সেবিকা ফরজানা আলমের জীবন অকালে ঝরে গেল মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে। এক দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে ফরজানার এই চলে যাওয়া! সে প্রসঙ্গে কিছু বলার নেই। সময়ই তার উত্তর দেবে। তবে কিছুদিন আগে আমাদের পল্লীর একটি অনুষ্ঠানে এসে ফরজানা যে সৌজন্যবোধ ও ভব্যতা দেখিয়ে গেছেন, তার সুমধুর স্মৃতি আজও আমার কাছে অম্লান হয়ে আছে ও থাকবে। সেই ঘটনাটি হলো :

আমাদের পল্লীর রাতের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে 'রাতের পাহারা' যা 'শান্তি কমিটি' নামে পরিচিত, তার বার্ষিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য গুণীজনদের মধ্যে আমাদের কর্পোরেশনের এই ভূতপূর্ব ডেপুটি মেয়র তরুণী-সেবিকা ফরজানা আলমও এসেছিলেন খুবই সাধারণভাবে। সভার নিয়ম অনুযায়ী মঞ্চে অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করে বসানোর ভার শান্তি কমিটির সভাপতি হিসেবে আমার ওপর ন্যস্ত ছিল। এখানে অতিথিরা যদি কেউ বয়ঃকনিষ্ঠও হন, তাঁকে উচ্চ সম্মান দিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান করা হয়। সভায় উপস্থিত অতিথিদের একে একে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে শেষকালে সেদিনের মাননীয় অতিথি ডেপুটি মেয়র ফরজানা আলমকে বিশেষ সমাদরসূচক কথা বলে মঞ্চে আসন গ্রহণ করতে বলি। দেখি পরমুহূর্তে ভগিনী ফরজানা এই ধরনের 'আপনিত্ব- সূচক আহ্বান বাদ দিয়ে সাধারণভাবে সম্ভাষণ করে বসার আহ্বান জানাতে বললে, আমি সম্মতি দিয়ে সেইভাবে ডাকলে, ফরজানা অত্যন্ত খুশি ও স্বস্তিবোধ করলেন। এরপর যতটা সময় সভায় ছিলেন, সাধারণভাবে বসে কথা বলে, পরে করপোরেশনের মাধ্যমে মানুষের সেবায় নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্যোগ ও প্রয়াসের বিষয়ে সাবলীলভাবে সহজ সরল কথায় বলে উপস্থিত পল্লীবাসীর ভালবাসা ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করলেন যা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে গেল।

এইরকম উদ্যোগী ও নিবেদিতপ্রাণ আজকের সমাজ জীবনে দুর্লভ। দুর্ভাগ্য দেশ ও সমাজের, একটি উৎসাহী জীবন তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারল না। অকালে পরিসমাপ্তি ঘটল একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার। দেশ ও সমাজের সঙ্গে পরিবারও হারাল তার আপনজনকে। ভগিনী ফরজানার আত্মার শান্তি কামনা করি।

—**রণজিৎ সিংহ,**
কলকাতা-৭০০০৩৬।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ভারসাম্য

সম্প্রতিকালে বিশেষ করে তৃণমূল শাসনের প্রারম্ভ থেকে বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলি যেমন মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দ্রুত হারে মুসলমান জনসংখ্যা

বেড়ে চলেছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যতোই এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা উক্ত জেলাগুলিতে বাড়ছে, ততোই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তির পরিমাণ নিত্যনতুন রূপ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সুস্থ বাতাবরণকে বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত করে চলছে। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমগুলিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের সংবাদ চোখে পড়ছে। স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগে যে, এর কি কারণ থাকতে পারে? এর একটি কারণ যেটা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় সেটা হলো প্রতিবেশী রাজ্য বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রতিদিন শয়ে শয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঘটছে। আর এর ফলে দ্রুত জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জনসংখ্যার ভারসাম্য হারিয়ে জেলাগুলিতে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। বেশিরভাগ অংশে মুসলমানরাই সংখ্যাগুরুতে পরিণত হচ্ছে। এরই ফলে অতি সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণেই বলা যেতে পারে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করলেই মহাবিপদ এবং তা এক তরফা দাঙ্গার রূপ নিচ্ছে। গত ৩ মে বর্ধমান জেলার জামালপুরের হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর মুসলমানদের আক্রমণই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এইসব তীর্থযত্রীরা নদীয়া জেলার জুড়ানপুর পঞ্চায়েতের নওদা গ্রামের বাসিন্দা। এর ফলে নদীয়া গ্রামের কালিগঞ্জের একই পরিবারের চারজন নিহত হয় ও বহু ব্যক্তি আহত হয়। আর এর মদতদাতা ছিলেন মহম্মদ নাসিরুদ্দিন আহমেদ যিনি কিনা তৃণমূল কংগ্রেসের ২০১১ সালের বিধায়ক। তিনি থানায় বসে থেকে পুলিশকে প্রভাবিত করেছেন বলে প্রকাশ। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মাননীয় বঙ্গেশ্বরী কয়েকজনকে অবশেষে এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করান। আর স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এর রেশ কাটতে না কাটতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হলো নদীয়ার হাসখালি ৮ মে। তারপরই বর্ধমানের সমুদ্রগড়।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন এই সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ, তবে এর পিছনে কি শুধু ভোটব্যাঙ্ক পুষ্ট করার জন্য অযাচিত সংখ্যালঘু তোষণ? এবং হিন্দু ভায়েরাই বিবেচনা করে দেখুক যে যারা কিনা হিন্দুস্থানের আদি অধিবাসী তারাই আজ নিজ দেশে পরবাসী, আর যাদের অস্তিত্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে এদেশে ছিল না তারাই আজ ঘটা করে বলে যে এটা তাদেরও দেশ! ইতিহাসই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাই এখন হিন্দু ভায়েদের এবার নিজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটু সজাগ হতে হবে। আর এটাও ভাবুন যে মুসলমান জনসংখ্যা আজ যেভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে তাতে করে আগামী দশকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার নিরিখে তারা ৪০ শতাংশ স্পর্শ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তখনই প্রশ্ন উঠবে পশ্চিমবঙ্গ বিভাজনের। যার পূর্বাভাস অনেক পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিয়ে গেছেন। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেকুলারবাদী হিন্দু ভায়েরা আবার ১৯৪৮ সালের দাঙ্গার পুনরাবৃত্তির জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত থাকতে পারেন।

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ,**
মুন্সিরহাট, হাওড়া।

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

অম্বুবাচী

নবকুমার ভট্টাচার্য

জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়েছে— আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে পৃথিবী রজোযুক্তা হন। তাকেই অম্বুবাচী বলে। সূর্য যে বারের যে সময় মিথুন রাশিতে গমন করে, তার পরবর্তী সেই বারের সেই কালে অম্বুবাচী হয়ে থাকে। স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্বম্' গ্রন্থে বলেছেন— 'আর্দ্রায়ঃ প্রথমে পাদে রবৌ গতি সত্তি অম্বুবাচী।' অম্বুবাচীতে বেদপাঠ এবং বীজবপন করবে না। ঐ সময় দুগ্ধপান করলে সর্পভীতি থাকে না। খনার বচনে অম্বুবাচী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'কিসের বার কিসের তিথি। আষাঢ়ের ৭ তারিখে অম্বুবাচী।' সত্যিই তাই। তিথি বার ইত্যাদি অম্বুবাচীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আষাঢ়ের ৭ তারিখ অম্বুবাচী। পশ্চিমবঙ্গে ৭ আষাঢ় হতে তিনদিন এবং ওড়িশায় জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি হতে তিন দিন অম্বুবাচীর কাল বলে ধরা হয়। ওড়িশায় এই উৎসবের নাম রজ উৎসব। রজ উৎসবে ওড়িশার ঘরে ঘরে আনন্দ। অফিস আদালত এই উপলক্ষে ছুটি থাকে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান' গ্রন্থে অম্বুবাচী প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে চাষি দেশের জনসাধারণের অন্নসংস্থান করিয়া থাকে, রৌদ্র-বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া যাহাকে উন্মুক্ত প্রান্তরে দিনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হয়, বিশ্রামের অবসর যাহার পক্ষে দুর্লভ, সেই চাষির ছুটি সত্য সত্যই বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে তাহাদেরও বিশ্রাম ও ছুটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নববর্ষের সূচনায় বছরের মধ্যে অন্তত তিনটি দিন সমস্ত রকম চাষের কাজ বন্ধ করিবার বিধান শাস্ত্রকারেরা দিয়াছেন।' দেবীভাগবতে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'অম্বুবাচ্যাং ভূখননং জলশৌচাদিকঞ্চ যে। কুর্বন্তি ভারতবর্ষে ব্রহ্মহত্যাং লভন্তিতে।।' শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণিও তাঁর কৃত্যতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে বলেছেন, 'রজস্বলা স্যাৎ পৃথিবী কৃষিকর্মবিগর্হিতা।' অম্বুবাচী বর্ষার সূচনা করে। ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'পূজাপার্বণের উৎসকথা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই সময় বাংলার কৃষকবৃন্দ তাদের হালযন্ত্রকে বিশ্রাম দেন।' প্রখ্যাত উপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর কোনো এক গল্পে বলেছেন, 'এই সময় শুধু হাল নয়, হালের গোরুটিও বিশ্রাম লাভ করে। অর্থাৎ আগামী দিনের পরিশ্রমের কথা ভেবেই কৃষক পরিবারের বিশ্রাম। বাংলার প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেকেই প্রমাণ উদ্ধৃত করে প্রতিপন্ন করেছেন— অম্বুবাচী দিনে হলকর্ষণ, বীজবপণ, ভূখনন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

'বাঙালি হিন্দুর নিকট ইহা বিধবার অবশ্যপালনীয় ব্রত হিসেবেই পরিচিত' — একথা বলেছেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। এই তিনদিন কোনো বিধবা অগ্নিপক্ক কোনো খাদ্য

গ্রহণ করেন না। অনেকে অম্বুবাচীর পূর্বে প্রস্তুত রুটি লুচি দই প্রভৃতি এই তিনদিন আহার করে থাকেন। অনেকে আবার কেবলমাত্র ফলমূল কাঁচা দুধ খান। এই তিনদিন বিধবাদের সম্পূর্ণ উপবাস না হলেও অর্ধোপবাস। যাঁরা এই সমস্ত নিয়ম পালন করতে পারেন না, তাঁরা এই সময় পুরী চলে যান। কারণ শ্রীক্ষেত্রে একাদশী, অম্বুবাচী নিষিদ্ধ। একাধিক প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থে অম্বুবাচীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এই সময়ে চাষবাসের সমস্ত কাজ বন্ধ রাখার বিধানই দেখতে পাওয়া যায়। অম্বুবাচীতে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোনো বিধিনিষিধের ইঙ্গিতমাত্র কোনো শাস্ত্রে নেই। কেবল প্রাচীন পঞ্জিকাকাররা এই সম্বন্ধে একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন। তবে সেই শ্লোকের কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি—

‘যতিনো ব্রতিনশ্চৈব বিধবা চ দ্বিজস্তথা
অম্বুবাচীদিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ।
স্বপাকং পরপাকং বা অম্বুবাচীদিনে তথা
ভোজনং নৈবকর্তব্যং চাণ্ডালান্নসময়ং স্মৃতম্।।’

অম্বুবাচী দিনে কোনো কোনো মন্দির বন্ধ থাকে, আবার কোনো কোনো মন্দিরে দেবতার মুখে আচ্ছাদন থাকে অর্থাৎ ঢেকে দেওয়া হয়। এই বিধানেরও কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অম্বুবাচী উপলক্ষে কামাখ্যার মেলা অতি প্রসিদ্ধ। এই মেলায় নানাস্থান হতে বহু নরনারী সমবেত হন। এসময় কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে বিশেষ সমারোহ সহকারে পুজোর ব্যবস্থা হয়। এখন প্রশ্ন, অম্বুবাচীর সঙ্গে দেবী কামাখ্যার সম্পর্ক কি? মা কামাখ্যা আসলে দেবী দুর্গারই অপর নাম। এখানে দেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হয়েছিল। একাধিক তন্ত্রে এবং পুরাণে এই স্থানকে মহাপীঠের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে। পীঠনির্ণয়ে এই পীঠের নাম দেওয়া হয়েছে কামগিরি। দেবী কামাখ্যার অপর নাম কামেশ্বরী। অম্বুবাচীতে যেহেতু পৃথিবী ঋতুমতী হন, সেজন্য এই সময়ে মহাপৃথিবী দেবী কামাখ্যারূপীর যোনি মণ্ডলে বিশেষ আরাধনা হয়। বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে সতীর দেহ খণ্ডিত হওয়ার সময় এই স্থানে দেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হয়েছিল। এই যোনিদেশের দৈর্ঘ্য একুশ আঙুল আর প্রস্থ প্রায় দেড় হাত। একটি সোনার টোপর দিয়ে সর্বদা সেই স্থান আচ্ছাদিত থাকে। মাতৃঅঙ্গ বলে এই আচ্ছাদনের ব্যবস্থা। এই যোনিমণ্ডল থেকে সর্বদা জলধারা বেরিয়ে আসছে। ভক্তদের খুব সন্তর্পণে দেবীর চিন্ময়ী প্রস্তরী যোনিমণ্ডলের জলধারা স্পর্শ করতে হয় এবং পবিত্র জলধারা কিঞ্চিৎ পান করতে হয়। অম্বুবাচী দিনে এই জলের রঙ নাকি পরিবর্তিত হয়। শাস্ত্রে রয়েছে— কেউ ভক্তি সহকারে দেবীর প্রস্তরী যোনিমণ্ডল স্পর্শ করে জলপান করলে দেহের সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হয় এবং পিতৃ-মাতৃ ঋণ থেকে মুক্তিলাভ করে। যোগিনীতন্ত্রের একাদশ পটলে এই বিধান রয়েছে। এই তন্ত্রেই রয়েছে অম্বুবাচী দিনে কামরূপে অনুষ্ঠিত জপ ও পুজো যে কোনো স্থান অপেক্ষা শতগুণ অধিক। তন্ত্রচূড়ামণি মতে, কামগিরি অর্থাৎ কামাখ্যাতে মাতঙ্গী, বগলা, কমলা প্রভৃতি দেবীরও পীঠ রয়েছে। অম্বুবাচীতে কামাখ্যাপীঠ গুপ্ত তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মাদির প্রকৃত স্থান। কামাখ্যা মন্দিরের দক্ষিণে সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নামলে ভৈরবীকুণ্ড। এরই একপাশে ভৈরবী মন্দির। মন্দিরের মধ্যে পঞ্চমুণ্ডির আসন ও একটি সিংহাসন রয়েছে। পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিকেরা অম্বুবাচীতে এই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে জপ করে শক্তি অর্জন করেন এখনও। ▮

মহাকবি কালিদাস

অশোক কুমার দাস

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাস। ইতিহাসের পাতা থেকে আজ আমরা তাঁকে হারিয়েছি। প্রচলিত কিংবদন্তী কিছু সত্য, কিছু কল্পনাপ্রসূত। তিনি ছিলেন অসীম গুণের অধিকারী, যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর অসীম গুণের জন্য

মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁকে নবরত্ন সভার পণ্ডিতদের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছিলেন।

৩৭৩ খৃষ্টাব্দে বর্তমানে বিহার রাজ্যের মধুবনী জেলায় উচ্চপীঠ গ্রামে ভগবতী মন্দিরের পাশে তাঁর জন্ম। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল জগন্নাথ। বাবা-মা আদর করে ডাকতেন কালো। গুরুদেব জ্ঞানার্জনের পর নাম দেন কালিদাস।

মা প্রজ্ঞাদেবী। পিতৃদেব বিশ্বম্বর ছিলেন দরিদ্র সৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। দেব মন্দিরে পুজো-পার্বণ বেদ-বেদান্ত পাঠ করে ঘুরে বেড়াতেন। অতি অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ ঘটে। মাতুলালয়ে বড় হতে থাকেন। পরে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য মঠ-মন্দিরে ঘুরে বেড়ান। জ্ঞানার্জনের কোনো সুযোগ ঘটেনি।

উচ্চপীঠ থেকে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে দামোদরপুর গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে বিশাল সরোবর। এই সরোবরে উত্তর-পশ্চিম কোণে দুর্গাস্থানে

ছিল ঋষি জনকের বংশধর রাজা মহাদেবরাজের রাজবাড়ি। এই মহাদেবরাজের দ্বিতীয়া স্ত্রীর একমাত্র কন্যা বিদ্যোত্তমা, ডাকনাম বিদ্যাবতী। কয়েকজন পণ্ডিতের চক্রান্তে কালিদাসের সঙ্গে বিবাহ হয় রাজকন্যা বিদ্যাবতীর। এই বিদ্যোত্তমা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং সুগায়িকা, যেন মা সরস্বতী। অসীম জ্ঞানের অধিকারিণী, তাই পণ্ডিতগণ ডাকতেন কমলা, সরস্বতী বা বিদ্যাবতী বলে।

রাজকন্যার স্বয়ংবর সভার শর্ত ছিল— যিনি তাঁকে শাস্ত্রসম্মতভাবে তর্কযুদ্ধে হারাতে পারবেন, তাঁরই গলায় বরমাল্য দেবেন। বহু পণ্ডিত তাঁর কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চরম অপমান ভোগ করতে থাকেন। এই তর্কযুদ্ধে ঘটে এক অঘটন। দেবরাজের রাজ পরিবারের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন ত্রিলোচন। এই ত্রিলোচনের কাছে সমস্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন বিদ্যাবতী। ত্রিলোচনের বাড়ি ছিল উচ্চপীঠ গ্রামে। উচ্চপীঠ গ্রামের তিনজন পণ্ডিত বিদ্যাবতীর কাছে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হন। এই তর্কযুদ্ধের প্রশ্নগুলি ধাঁধার মতো, যা গভীর জ্ঞানী না হলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। পণ্ডিত ত্রিলোচনের সঙ্গে উচ্চপীঠ নগরীর পণ্ডিতগণ আলোচনা করে প্রশ্ন ও উত্তরগুলি জেনে ফেলেন। প্রতিশোধের ইচ্ছায় পণ্ডিতরা ষড়যন্ত্র করে জগন্নাথকে বিদ্যাবতীর স্বয়ংবর সভায় নিয়ে আসেন। জগন্নাথের শরীর স্বাস্থ্যটি ছিল মহাদেবের মতো। সুন্দর সুস্বাস্থ্য সবলদেহ নিজেকে মহাদেব সাজতেও ভালোবাসতেন। খাওয়া-দাওয়ায় ছিলেন পটু। রাজবাড়িতে উৎসব, ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ রয়েছে। মহারাজ ব্রাহ্মণদের প্রচুর উপঢৌকন দেবেন। ‘তুমি নীরব থাকবে, কোনো কথা বলবে না। যা কিছু বলবে আকার ইঙ্গিতে।’ পণ্ডিতগণ এইভাবে বুঝিয়ে, সুঝিয়ে রাজবাড়িতে বিদ্যাবতীর স্বয়ংবর সভায় নিয়ে যান জগন্নাথকে। পণ্ডিতগণ সভায় জানান, এই দিনে এই ব্যক্তির পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। তাই আজ মৌনব্রত করেছেন। রাজকন্যাকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। পাত্রও আকার ইঙ্গিতে উত্তর দেবেন। সেগুলি আমরা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব। বিদ্যাবতী এক আঙ্গুল দেখালেন, জগন্নাথ দুই আঙ্গুল দেখান। পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করলেন, বিদ্যাবতীর প্রশ্ন হল ঈশ্বর এক না দ্বিতীয়? জগন্নাথের আকার ইঙ্গিতটি পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করলেন ঈশ্বর দুই রূপ। পরমেশ্বর ও রাজেশ্বর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই পৃথিবীতে যখন অধর্মের সৃষ্টি হয়, তখন আমি এই ধরাধামে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ধর্মের প্রতিষ্ঠা করি। আমাকে, আমার কর্মকে যিনি জানেন, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী। আর সকলেই অজ্ঞানী। এই পণ্ডিত ব্যক্তি মহাজ্ঞানী। এই রাজসভায় অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রশ্নের উত্তর সঠিক হওয়ায় সকলে শঙ্খধ্বনি ও বিজয় উল্লাস করতে থাকেন। বিচারক নির্দেশ দেন উত্তর সঠিক হয়েছে। বাবা-মায়ের আশীর্বাদে বিদ্যাবতী বরমাল্যটি পরিয়ে দেন জগন্নাথের গলায়। পরমুহূর্তে পণ্ডিতগণ রাজবাড়ির গোপন দরজা দিয়ে উত্তর দিকে কমলানদী সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যান। জগন্নাথের সঙ্গে বিদ্যাবতীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রাজবাড়ির সকলে পরে জানতে পারেন, পণ্ডিতগণ ঠকিয়ে পালিয়ে গেছেন। বিদ্যাবতী জানতে পারেন তাঁর স্বামী মহামুর্খ। তখন তিনি স্বামীকে তাড়িয়ে দেন। জগন্নাথ উত্তর পাশে কমলা নদীর পাড় হয়ে আত্মগোপন করে আশ্রয় নেন দামোদরের গুরুকুল আশ্রমে। পরিচয় দেন— পিতৃমাতৃ, সহায়সম্বলহীন ব্রাহ্মণ। নাম জিজ্ঞেস করায় বলেন, কালো। গুরুদেব ডাকতেন— কালিয়া। সকলে ডাকতেন— ঠাকুরমশায়।

মহাদেবরাজ জানতে পেরে সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে উচ্চপীঠ নগরীকে ধ্বংস করে দেন। পণ্ডিতগণ আগেই অন্য রাজ্যে পালিয়ে যান। পরে বিদ্যাবতীর সঙ্গে জগন্নাথের পুনরায় মিলন ঘটে, তখন মহাদেবরাজ উচ্চপীঠ নগরীর পণ্ডিতদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ করে দেন।

এই গুরুকুল আশ্রমে অতি অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যাভ্যাসের ফলে জগন্নাথ গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। গুরুকুল আশ্রমের ছাত্রদের সঙ্গে তিনি বহু দেশ-বিদেশে তীর্থ পরিদর্শন করেন। পরে এই আশ্রমের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

মহাদেবরাজের দুটি রাজবাড়ি। একটি দামোদরপুর গ্রামে আর একটি জনক ঋষির আশ্রমের পাশে। দুর্গাপুজোর পরেই ছদ্মবেশে এই রাজবাড়িতে নাটক করতে গিয়ে জগন্নাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশদেশান্তরে। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর লেখা নাটকগুলি ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই নাটকগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন বিদ্যাবতী। বিদ্যাবতীর প্রেরণায় এই নাটকগুলি লেখেন তিনি। সরোবরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মহাদেবের মন্দির। সেই মন্দিরে জগন্নাথ প্রত্যহ পুজো দিতে যেতেন। রাজবাড়ির সকলে এই মহাদেবের মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন। বিদ্যাবতীর সখীরা হঠাৎ একদিন চিনতে পারেন, জগন্নাথ ছদ্মবেশে এখানেই আছেন। বিদ্যাবতী রাজপরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথের কাছে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চান এবং রাজ পরিবারে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেন। সংসার জীবনে আর তিনি ফিরে আসতে রাজি হননি। পণ্ডিত দামোদর চিঠি লিখে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় স্থান করে দেন। সেই চিঠিতে পণ্ডিত মহাশয়ের নামকরণ করেন কালিদাস। ভারতবাসীর কাছে কালিদাস নামেই তিনি পরিচিত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁকে রাজসভায় রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন। অল্পদিনের মধ্যে কর্মদক্ষতায় সমস্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হন।

কথিত আছে, বিক্রমাদিত্যের রাজসভার জনৈক পণ্ডিত ঈর্ষান্বিত হয়ে চক্রান্ত করে সিংহলে অশোককাননে তাঁকে হত্যা করেন। সেখানেই চিতায় তাঁর দেহ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ■

ডাকাত নাকি?

সুকুমার রায়

হারুবাবু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছেন। স্টেশন থেকে বাড়ি প্রায় আধ মাইল দূরে। বেলাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হারুবাবু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলছেন। তাঁর এক হাতে ব্যাগ, আর এক হাতে ছাতা।

চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর পিছন পিছন আসছে। তিনি আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন, সত্যি সত্যি কে যেন ঠিক তাঁরই মতন হনহনিয়ে তাঁর পিছন পিছন আসছে। হারিবাবুর মনে কেমন যেন ভয় হলো— চোর ডাকাত নয়তো! ওরে বাবা! সামনের ওই মাঠটা পার হবার সময় একলা

পেয়ে যদি হঠাৎ ঘাড়ের উপর দু'চার ঘা লাঠি কষিয়ে দেয় তাহলেই তো গেছি! হারুবাবুর রোগা রোগা হাত পা দু'টো কাঁপতে কাঁপতে ছুটতে লাগল। কিন্তু লোকটাও যে সঙ্গে সঙ্গে ছোটে।

তখন হারুবাবু ভাবলেন, সোজা মাঠের উপর দিয়ে গিয়ে কাজ নেই। বড় রাস্তা দিয়ে বদ্যিপাড়া ঘুরেই যাওয়া যাক, না হয় একটু হাঁটাই হলো। তিনি ফস্ করে ডানদিকের একটা গলির ভিতর ঢুকেই বক্সীদের বেড়া টপকিয়ে একদৌড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। ওমা! সে লোকটাও কি দুষ্টু, সেও দেখাদেখি ঠিক তেমনি করে বেপথ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে হাজির।

হারুবাবু ছাতাটাকে বেশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন— ভাবলেন, যা থাকে কপালে, কাছে আসলেই দু'চার ঘা কষিয়ে দেব। হারুবাবুর মনে পড়ল, ছেলেবেলায় তিনি জিমনাস্টিক করতেন— দু'তিনবার তিনি হাতের 'মাসল' ফুলিয়ে দেখলেন এখনও শক্ত হয় কিনা।

আর একটু সামনেই কালিবাড়ি। হারুবাবু তার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ঝোপজঙ্গল ভেঙে প্রাণপণ ছুটতে লাগলেন। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন যে, লোকটাও সঙ্গে সঙ্গেই ছুটছে! এ কিন্তু ডাকাত না হয়ে যেতেই পারে না! হারুবাবুর হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল, সামনে ঘাটের পাশে বসে কারা যেন গল্প করছে।

শুনবামাত্র হারুবাবুর মনে সাহস হলো। তিনি ধাঁ করে ছাতা বাগিয়ে সিংহবিক্রমে ফিরে বললেন, "তবে রে! আমি টের পাইনি বুঝি? ভালো চাস ত—" কিন্তু লোকটির চেহারা দেখে হঠাৎ তাঁর বক্তৃতার তেজ কমে গেল। অত্যন্ত নিরীহ রোগা ভালোমানুষ গোছের লোকটি— ডাকাতের মতো একেবারেই নয়।

হারুবাবু তখন একটু নরম মতো ধমক দিয়ে বললেন— "খামখা আমার পেছন পেছন ঘুরছ কেন হে?" লোকটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে আর থতমত খেয়ে বলল, "স্টেশনের বাবুটি যে বললেন, আপনি বলরামবাবুর পাশের বাড়িতেই থাকেন, আপনার সঙ্গে গেলেই ঠিকমতো পৌছব। —তা আপনি কি বরাবর এইরকম করে বেঁকেচুরে চলেন নাকি?" হারুবাবু ঠিক এক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে থেকেও বলবার মতো কোনো জবাব খুঁজে পেলেন না। কাজেই ঘাড় হেঁট করে আবার সোজা পথে বাড়ি ফিরে চললেন।

মনীষী কথা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন, নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায়। বাবা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর। ছেলেদের লেখাপড়ায় ও কাজকর্মে বাবার সজাগ দৃষ্টি ছিল। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিএ পরীক্ষা চালু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ওই বছরই সেখান থেকে স্নাতক হন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি শুরু করেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কমলাকান্তের দপ্তর এরকম বহু উপন্যাস তিনি রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আনন্দমঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাস স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তার রচিত বন্দেমাতরম্ স্বাধীনতার মন্ত্রে পরিণত হয়। জাতীয় ভাবনায় সমৃদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি হিসেবে পরিগণিত হন।

প্রশ্নবাণ

১. কে বাংলার বাঘ নামে পরিচিত?
২. গীতাঞ্জলি কার রচনা?
৩. সুকুমার রায়ের বাবার নাম কী?
৪. ব্রাহ্মসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
৫. বিবেকানন্দের বাল্যনাম কী?

উত্তর : ১. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ৪. রামমোহন রায়। ৫. বিলে।

ছবিতে অমিল খোঁজ

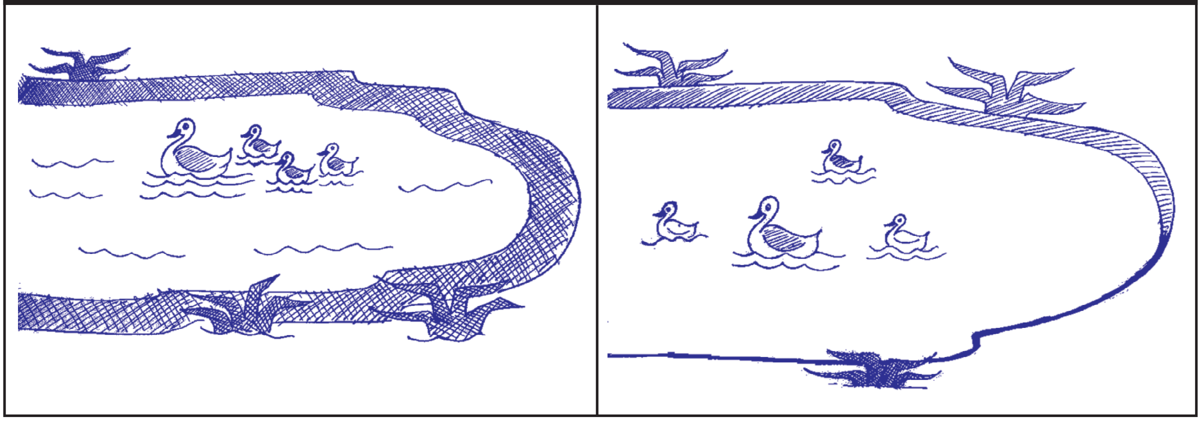

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

১) ব্য শ স্ত
২) মা দ মা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

১) লা ক মা থা
২) পু য়া লি রু

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৮০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

সমাজের চোখে অত্যাচারিতা নারী

রিনি রায়

যৌন অত্যাচার সামাজিক ব্যাধি। বর্তমানে এমন কোনো একটা দিন বাদ যায় না যেদিন এই সামাজিক ব্যাধির খবর সকালে সংবাদপত্রের পাতায় আমাদের নজরে না পড়ে। বিকৃত কামের লালসার হাত থেকে রেহাই পায় না আট থেকে আশির যে কোনো বয়সী শিশু, নারী বা বৃদ্ধা। ভারতে প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো সময়ে এই সামাজিক ব্যাধির শিকার হয়ে চলেছে মেয়েরা। মিডিয়ার দৌলতে কয়েকজনের খবর আমাদের গোচরে আসলেও বেশিরভাগ দুর্ভাগা নারীর যন্ত্রণার গোঙানিই আমাদের কান পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। আর যাদের খবর আমরা পাই, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের তথা সমাজের ভূমিকা থাকে বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলের চুলচেরা বিশ্লেষণে 'টি.আর.পি. রেট' বাড়ানোয়, সংবাদপত্রের 'সারকুলেশান' বাড়ানোয়, সমবেদনায়, সমালোচনায়। আবার কারোও কাছে এ নিছকই এক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াহীন সংবাদ। বর্তমানে প্রায় প্রতিদিনই ধর্ষণের খবর শুনতে শুনতে আমরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে এই প্রকার খবর আমাদের কাছে গা সওয়া হয়ে গেছে। আমরা খবর পড়ি, শুনি আর তারপর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টে অন্য পাতায় চলে যাই অথবা টিভির রিমোট ঘুরিয়ে অন্য চ্যানেলে। আর এসবের মাঝেই আমরা বাদ দিয়ে যাই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, যে সংবাদপত্রে ধর্ষণের বিরুদ্ধে নানারকম ধিক্কার, তীব্র প্রতিক্রিয়া, তাদেরই পাতায় কামউদ্রেককারী বড় বড় বিজ্ঞাপন।

ধর্ষণ না হয় সামাজিক ব্যাধি, ধর্ষক না হয় এক ঘৃণ্য মানুষ। কিন্তু ধর্ষিতা? তার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ? দুর্ঘটনা পরবর্তীকালে কতটা উদারতার সঙ্গে সমাজ এদের গ্রহণ করে? ধর্ষিতা নারীদের উপরেই বা সমাজ কতটা দায়বদ্ধ?

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে আজও অধিকাংশ ভারতীয় পিতা মাতা তার পুত্রের জন্য কোনো ধর্ষিতা মেয়েকে পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করতে নারাজ এবং সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো বহু শিক্ষিত যুবক কোনো ধর্ষিতাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে চান না। অথচ দিল্লী হোক বা 'মুম্বইয়ের শক্তিমিলস্ ধর্ষণকাণ্ড অথবা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পার্কস্ট্রিট, কামদুনি-সহ যে কোনো সাম্প্রতিক ধর্ষণকাণ্ডের ক্ষেত্রেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি দেশের যুবসমাজ 'যুবাজোশ' নিয়ে এই সকল ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছে 'Hang the rapist'-এর মতো পোস্ট বা মন্তব্য। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে যখন এই সমবেদনা, সমালোচনার 'স' গুলো আস্তে আস্তে ফিকে হতে শুরু করে, তারপরই এই ধর্ষিতা মেয়েদের উপর সমবেদনা যেন কর্পূরের মতোই উবে যায়। যেসকল যুবক ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল, তাদেরই অধিকাংশ কিন্তু কোনো অবিবাহিতা নির্যাতিতা মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পেতে চায় না। আজও ধর্ষিতা নারীকে 'অপবিত্র' বলে গণ্য করা হয়। আর তাই সমাজের কোনো কোনো মানুষ ধর্ষিতা মেয়েকে পুত্রবধূ হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে অবলীলায় বলতে পারেন, 'I want a 'clean' girl. My Son is 'clean'' (তথ্যসূত্র : WIF, একটি ইউটিউব চ্যানেল)। ভুলে গেলে চলবে না এই মানুষগুলোই কিন্তু সমাজের প্রতিবিম্ব। আর এই মানসিকতার সূত্র ধরেই ভারতীয় আইনে মান্যতা রয়েছে ধর্ষিতাকে ধর্ষকের বিবাহ করতে পারার মতো আইন। কারণ একজন ধর্ষিতা এই প্রকার বিবাহের মাধ্যমেই আবার ফিরে পেতে পারে তার হারানো সম্মান। আদালতে ধর্ষকের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির পক্ষে আমরা সওয়াল করলেও একবারের জন্যও কি আমাদের মনে হয় না যে আমাদের সমাজ ওই ধর্ষকের মতোই সমান দোষী, বরং বলা ভালো একটু বেশিই দোষী। সমাজ নির্যাতিতা মেয়েটিকে মানসিকভাবে আঘাত করে বারবার।

কিন্তু এখন এই পুরনো, পচাগলা মানসিকতার পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে ধর্ষিতাকে সমবেদনা নয়, সাহস জোগানোর; প্রয়োজন আছে 'ধর্ষিতা নারী', 'ধর্ষিতা কিশোরী'-র মতো শব্দযুগল ব্যবহার করে তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করার বদলে শুধুই নারী বা কিশোরী বলে সম্বোধন করার। তার সঙ্গে সমাজের অন্য মেয়েদের মতোই আচরণ করা প্রয়োজন। মিডিয়ার সম্পূর্ণ 'ফোকাস' কেবলমাত্র ধর্ষিতা মেয়েটির উপর না থেকে ধর্ষকের প্রতিও থাকা উচিত। যারা ধর্ষণের প্রতিবাদে এগিয়ে আসছে, তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলোর অবসান ঘটানোর। মানুষকে বোঝাতে হবে purity doesn't lie in virginity, rather its a mental state। যদিও আশার কথা সংখ্যায় খুব অল্প হলেও কিছু যুবক এই বিষয়ে এগিয়ে এসে নির্যাতিতা মেয়েদের অতীতের দুর্ঘটনা ভুলে নতুন জীবন তৈরিতে সাহায্য করছেন এবং আশা করা যায়, দেরিতে হলেও ভারতীয় সমাজ তার স্বভাবজাত উদারতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এ বিষয়ে আরোও সচেতন হয়ে আগামীদিনে নির্যাতিতা মেয়েদের সম্মানের চোখে দেখার প্রয়াস করবে। ■

সামরিক সাফল্য বুক বাজিয়ে জানান দিতে হবে

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

আজ থেকে ২৪ বছর আগের একটি লেখায় আমি অনুতাপ করে লিখেছিলাম ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনানীর বিরাট জয়ের ২০ বছর পুর্তি উৎসব দেশ পালনই করল না। ওই একই নিবন্ধে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেছিলাম যে বস্তুত বিগত এক হাজার বছরের ভারতের ইতিহাস ভারতবাসীর কাছে অবমাননাকর শুধু নয়, সব ধরনের আধিপত্যবাদের কাছে মাথা নোয়ানোর কাহিনি। সেই পটভূমিকায় ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ঐতিহাসিকভাবে এক সহস্রাব্দের পর আমাদের যথার্থ সামরিক বিজয়।

আমার এই দৃঢ় কিন্তু একেবারে নিখাদ সত্য ভাষণটিতে অনেক তথাকথিত উদারমনা বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকেই আমায় আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল। এমনকী আমার বিশেষ বন্ধু ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ আমার বক্তব্যকে 'উগ্র যুদ্ধবাজের হুঙ্কার' আখ্যা দিতেও দ্বিধা করেননি।

অজিত দোভাল

দলবীর সিং সুহাগ

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতো করে বলেছিলেন যে দেশের সাফল্যগুলির সম্পর্কে যতটা কম প্রচার করা যায় ততটাই ভাল।

সাম্প্রতিক মায়নমারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সফল অভিযান হয়তো গুরুত্বে ১৯৭১-এর ঘটনার সমগোত্রীয় নয়। কিন্তু এর পরেই দেশব্যাপী যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল তা অবশ্যই ২৪ বছর আগে আমার লেখাটির কথা মনে পড়ছে।

ভাবলে অবাক হতে হয়, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা দেশের সামরিক সাফল্য নিয়ে এত লজ্জা লজ্জা ভাব কেন করেন? জুন মাসের ৪ তারিখে মায়নমারে সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ে থাকা নাগা বিদ্রোহীরা ভারতে ঢুকে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের নৃশংসভাবে খুন করে যায়। স্বাভাবিকভাবে দেশজুড়ে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীকে ঢিলেঢালা গোত্রের তকমা দেওয়া ছাড়াও তাঁকে আদতে কাগুজে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তারপর ভারতীয় সেনাবাহিনী মায়নমারে ঢুকে যে প্রত্যুত্তর দিয়ে ফিরে এল তাতে এই সমালোচকদেরই হয়তো সেই ৫৬ ইঞ্চি ছাতির প্রবাদবাক্য ঝালিয়ে নিতে হবে।

সামরিক রীতিনীতি অনুযায়ী সব সময়ই যে জনগণের অসন্তোষের কারণেই চটজলদি শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এমনটা বাধ্যতামূলক নয়। কোনো একটা বড় ধরনের ঘটনার পরে পরেই দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কিছুটা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ঠিকই, বিশেষ করে যখন সামরিক বা অসামরিক মৃত্যু ও ক্ষয় ক্ষতির সংখ্যা বেশি থাকে। এমন পরিস্থিতিতে সরকার অনেক সময়ই ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করে। তাই চটজলদি সিদ্ধান্ত না নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু বেশ কিছুকাল ধরেই এটা দেখা গেছে যে এই সংযমের নীতি আসলে কিছু না করা অর্থাৎ কোনোদিনই প্রত্যুত্তর না দেওয়ার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদী হামলাকারীরা অনেক সময়ই কূটনৈতিক আলোচনার তোয়াক্কা করে না। যেমন তারা জানে তাদের আসল প্রভুরা তো মদত দিয়ে যাবেই।

আমাদের দেশের অন্যান্য কয়েকটি বিপদসঙ্কুল সীমান্ত অঞ্চলে আরও প্রতিকূল প্রতিবেশী দেশের মদতে মাওবাদীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিহত করার সঙ্গে এই অভিযানকে এক করে ফেললে চলবে না। ভারতের নানান প্রান্তে চলা অস্থিরতাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে তাই মোকাবিলা করা যায় না। কিছুটা নমনীয় যাকে বলে অ্যাডজাস্টেবল, অনেক সময় সেই পদ্ধতিতেই দেশের ক্ষমতা অনুযায়ী ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা অনুযায়ীই পাল্টা আঘাত হানা যায়। মায়নমারের ঘটনায় কেবলমাত্র প্রতিবেশী দেশটির সীমান্ত পেরিয়ে সামরিক অভিযান চালানো মুখ্য ছিল না। লক্ষণীয় ছিল, কী আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতি-আক্রমণটি সংঘটিত হয়েছিল। এই অভিযান থেকে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তিনটি বিষয় সামনে এসেছে—

(১) সামরিক গোয়েন্দা বা গুপ্তচর বিভাগ সঠিক খবরাখবর দিতে সদা তৎপর। সামরিক বাহিনীও পূর্ণরূপে যে কোনো অভিযানের জন্য প্রস্তুত। বিষয়টা অবশ্যই দেশের পক্ষে নিশ্চিন্ততার প্রতীক।

(২) দেশের কূটনৈতিক, সামরিক ও

সর্বোপরি রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে পূর্ণ তালমিল রয়েছে।

(৩) এটি প্রাঞ্জলভাবে প্রমাণ করেছিল যে কেউ চটে গেল কী কারুর মনঃপুত হলো না এসবের তোয়াক্কা না করে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কঠিন ও ঝুঁকিবহুল যে কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। যদি তা দেশের স্বার্থে হয়।

আবার একদল বলতেই পারে এই ধরনের নীরবতারও আন্তর্জাতিক আঙিনায় সুফল থাকতে পারে। উদাহরণ দিয়ে তাঁরা ইজরায়েলের প্রসঙ্গ তোলেন। দেশটি বহুবিধ আন্তর্জাতিক আগ্রাসনের পরিমণ্ডলে অবস্থান করা সত্ত্বেও অতি সন্তর্পণে বহু সফল 'বিশেষ অভিযান' চালিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্যগুলি খুব একটা প্রচারের আলোয় আসেনি। তাহলে মায়নমারের এই সাফল্যকেও সেইভাবে 'না বলা বাণী' করে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল?

এখন দেখার হচ্ছে, যদি এই অভিযানের কেবল ও একমাত্র উদ্দেশ্য হোত NSCN (K) 'খাপলাং' জঙ্গি গোষ্ঠীকে একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে আলোচনার টেবিলে বসানো। সেক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে নীরবতা অবলম্বনের অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল আরও বড় ও ব্যাপ্ত। ভারতে বিস্তীর্ণ সীমানা জুড়ে যে নানান জঙ্গি ও আগ্রাসী বাহিনী নিরন্তর ভারত-বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে তাদের একটা সবক শেখানো যে, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা নীতি ও ভাবনার ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেনা অভিযানের তাৎপর্য গল্পের নীতিকথার মতো— যারা দেশের নিরাপত্তার ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করবে তাদের দ্বিগুণ আঘাত পেতে হবে। এটি একটি চূড়ান্ত নীতিগত পরিবর্তন, তাই সোচ্চারে ঘোষণার প্রয়োজন রয়েছে। এটা আদি অকৃত্রিম Deterrence অর্থাৎ আমিও আক্রমণ করব না, আর তুমিও আক্রমণ করার নীতি অনুসরণ করো না। আর সেই বজ্রনির্ঘোষ নানা সীমান্তের ওপারেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আর কষ্টের হলেও এর অন্তর্নিহিত সঙ্কেতটি চোঁয়া ঢেঁকুর তুলে হজম করতে হচ্ছে।

ভারত-মায়ানমার সীমান্তে প্রহরারত সৈনিক।

একটা জিনিস লক্ষ্য করার, এই সফল অভিযানের পরে পরেই কেন সীমান্ত পেরিয়ে শত্রু দমন করতে দেশ proactive হয়ে উঠল। তা নিয়ে সরকারের সমালোচনা যতটা না শোনা যাচ্ছে তার থেকে ঢের বেশি শোরগোল কেন, সরকার এখন ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানান দিয়ে মিডিয়ায় সাফল্যের প্রচার করছে। বিরোধীদের ভয়ঙ্কর গাত্রদাহ হচ্ছে— গোটা ব্যাপারটা সামরিক বিষয়ের বাধ্যবাধকতা বলে নীরব সাফল্য হিসেবে চুপিচুপি রেখে দিলে ভাল হোত। প্রচারের আলোয় এনে দেশবাসীকে গর্বান্বিত করাটা ৫৬ ইঞ্চি ছাতি দেখানোর সমান হচ্ছে না কি? হায়! এই ক্ষোভ মেটার নয়।

আজ পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে ভারত একটি আঘাত সহ্য করার আধার (punching Bag) দেশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

আজ সময় হয়েছে প্রত্যাঘাতের, আর তাতে যদি হাজার বছর ধরে চলা সহনশীলতা বা নীরব থাকার শালীনতার নামে চাকরবৃত্তিকারীদের আঘাত লাগে লাগুক, কিছু করার নেই। ■

ভয়ঙ্কর অপরাধ দমনে চাই কড়া শাস্তি

সুহাস বসু

সম্প্রতি ধর্ষণ ও খুনের এক মামলায় নারীর প্রতি অত্যাচারে অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি দেওয়ার জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন (দি টেলিগ্রাফ, ১০.৫.২০১৫)। যে কেস সম্বন্ধে সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত দিয়েছেন সংক্ষেপে তা এই— ২০০৭ সালে পুনের এক ক্যাব ড্রাইভার পুরুষোত্তম বরাটে ও তার বন্ধু প্রদীপ কোকাদে এক বিপিও কর্মীকে গণধর্ষণ করে খুন করে। নিম্ন আদালত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়। তারপর তা সুপ্রিম কোর্ট অবধি যায়। সুপ্রিম কোর্টে আসামিদের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড রোধ করবার জন্য কারণ দেখানো হয়। (১) অপরাধীদের বয়স অল্প, (২) তাদের পরিবার আছে এবং (৩) তাদের পূর্ব অপরাধের কোনো ইতিহাস নেই। সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা অবশ্য তাদের এই যুক্তি অগ্রাহ্য করে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন।

শুধু ধর্ষণ, হত্যা ও নারীজাতির প্রতি জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট এই মন্তব্য করলেও সমাজে যে অহরহ খুন, অপহরণ ও খুন, ডাকাতি ও খুন ইত্যাদি জঘন্য ঘটনা ঘটে চলেছে সে সব ক্ষেত্রে অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি যাতে নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে আদালতের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সত্য কথা বলতে কী খুন করা এখন অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোভে খুন, প্রতিশোধ নিতে খুন, অতি তুচ্ছ কারণে খুন, এমনকী কোনো বাহ্যিক কারণ ছাড়া খুন নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতা খুললেই কিংবা রেডিও ও টিভি চালালে আমরা এইসব বীভৎস খুনের ঘটনা দেখতে পাই। এই বেপরোয়া মুড়ি মুড়কির মতো খুনের কারণ উপযুক্ত শাস্তির অভাব। তাই খুন করতে কোনো ভয় নেই। কারণ খুনিরা জানে যে তারা যত গুরুতর অপরাধই করুক না কেন তা 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' পর্যায়ে পড়বে না এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড হবে না। বড় জোর তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে যা তারা থোড়াই কেয়ার করে। কারণ এই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো কয়েক বৎসর কারাবাস, তারপর মুক্তি। আর বন্দী থাকলেও তারা জেলের— যার নাম এখন সংশোধনাগার নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। অতএব তারা যে এই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে আদৌ ভয় করবে না বা আমল দেবে না তাতে আর আশ্চর্য কি!

১৯৮৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট সব খুনকে দুই ভাগে ভাগ করেন। (১) বিরলের মধ্যে বিরলতম এবং (২) অন্যান্য সব খুনকে সাধারণ খুন হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আসামিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় যার সংখ্যা মোট খুনের এক শতাংশ হয় কিনা সন্দেহ। এখন এই বিরলের মধ্যে বিরলতম-র কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। এক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ বিচারপতিদের ব্যক্তিগত অভিমতের

উপর নির্ভর করে। একজন বিচারপতির কাছে যে খুন বিরলের মধ্যে বিরলতম গণ্য হয় অন্যদের কাছে আবার তা নয়। হাইকোর্ট যাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম মনে করেন সুপ্রিম কোর্ট তা নাকচ করে দেন— মৃত্যুদণ্ডও বাতিল করে দেন।

কিন্তু খুনের মধ্যে এই বিভাজন কি সঠিক? সব খুনই খুন। ব্যতিক্রম শুধু আত্মরক্ষার্থে খুন। সবক্ষেত্রে খুন হওয়া ব্যক্তি খুনিদের হাতে সমান ব্যথা পায়, মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে, বাঁচার চেষ্টা করে। খুনিদের কাছে প্রাণভিক্ষা করে— যেমন একবালপুরের মহিলা ও তার দুই কন্যা ও হালের হাওড়ার বালক বিশাল করেছিল। কিন্তু তাতে খুনিদের কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। তারা চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদের শিকারের প্রাণ কেড়ে নেয়। খুন হওয়া ব্যক্তির মাতা-পিতা-স্ত্রী- পুত্র-কন্যা, আত্মীয় স্বজন মানসিক ও আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গোটা পরিবার পথে বসে। স্বচ্ছল অবস্থা থেকে রাতারাতি পথের ভিখারিতে পরিণত হয়।

যে সব ক্ষেত্রে খুনিরা কোনো প্ররোচনা ছাড়া বা হঠাৎ উত্তেজনার বশে আগে থেকে পরিকল্পনা করে ঠাণ্ডা মাথায়

অপরাধ অর্থাৎ খুন করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত বলে উক্ত মামলার রায়দান কালে সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমাদের বিচারব্যবস্থা হত্যাকারীকে— তা যতই জঘন্যতম হোক না কেন— মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। উদাহরণ বারাসতের তরুণ রাজীব দাসের জঘন্য হত্যাকাণ্ড। ভাবুন তো কোনো প্ররোচনা ছাড়া অজস্র ছোরা মেরে কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকারীরা তরুণ রাজীব দাসকে হত্যা করেছিল। অথচ মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে মাননীয় বিচারক তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন। রানাঘাটে দুই সন্তানের মা গৃহবধূকে ডাকাতরা চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়ে তিনতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। সেক্ষেত্রে অবশ্য নিম্ন আদালত মৃত্যুদণ্ড দেয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড হাইকোর্ট ওই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ পর্যায়ে পড়ে না বলে সেই দণ্ড বাতিল করে দেন। অনুরূপভাবে নদীয়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে ৩০ বছরের গৃহবধূ ও তার বারো বছরের বালকপুত্রকে হত্যা করার পর সুপ্রিমকোর্ট হারু ঘোষকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ৩৫ বছর কারাদণ্ড দেন।

অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং অন্যান্য মৃত্যুদণ্ড-বিরোধী মানবাধিকার সংগঠনসমূহ মৃত্যুদণ্ড না দেবার স্বপক্ষে বলে— (১) রাষ্ট্রের যখন প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা নেই তখন তা নেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়, (২) মৃত্যুদণ্ড মানবাধিকার বিরোধী এবং (৩) পৃথিবীর বহু দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়া হয়েছে। এদের এইসব যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায়— রাষ্ট্রের জীবন দেওয়ার ক্ষমতা নেই সে কথা ঠিক, কিন্তু খুনির কী জীবন দেওয়ার ক্ষমতা আছে? সে কোন ক্ষমতার বলে একজনের প্রাণ নেয়? তার কি অধিকার আছে একজনের প্রাণ কেড়ে নেবার? অপরকে যারা বাঁচতে দিল না কোন অধিকার আছে সেই খুনির এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার? আর চরমদণ্ড মানবতা বিরোধী। উত্তরে বলা যায় মানুষ হলে তবে তো তার মানবাধিকার পাওয়ার যোগ্য। যে খুনি অবলীলায় বিবেকহীন নিষ্ঠুরভাবে অপরকে হত্যা করল সে কি মানুষ যে তার মানবাধিকার থাকবে? আর পৃথিবীতে বহু দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়া হলেও আজও বহুদেশে তা চালু আছে। আর যে সব দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়া হয়েছে সেখানে আমাদের দেশের মতো তুচ্ছ কারণে মুড়ি মুড়কির মতো হত্যাকাণ্ড হয় না— সেসব দেশে হত্যার মতো জঘন্যতম অপরাধের সংখ্যা খুবই কম। আর হত্যাকাণ্ডের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত।

অ্যামনেষ্টি ইনটারন্যাশনাল কি এদেশে অসংখ্য খুন বন্ধ করতে পারবে যে তাদের কথা শুনতে হবে? আর যে সব মানবাধিকার সংগঠন মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করে তাদের নিজেদের পরিবারের কেউ খুন হলে তৎক্ষণাৎ তারা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে খুনিকে চরম দণ্ড দেওয়ার জন্য চিল চীৎকার শুরু করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই একই কথা মাননীয় বিচারপতিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। খুন হওয়া, অপহৃত হয়ে খুন হওয়া, ধর্ষিত হয়ে খুন হওয়া ব্যক্তি যদি বিচারপতিদের পরিবারের কেউ হতেন তবে কি অপরাধীকে চরম দণ্ড না দিয়ে তিনি তাকে লঘু দণ্ড দিতেন?

বিচার চলাকালীন আসামি পক্ষের উকিল লঘুদণ্ড দেওয়ার জন্য নানা যুক্তি খাড়া করেন— যেমন আসামির বয়স কম, তাদের পরিবার আছে, তাদের অপরাধের কোনো পূর্ব ইতিহাস নেই, তারা গরিব ঘর থেকে এসেছে; পক্ষান্তরে তাদের ভিকটিম ধনী, তারা সঙ্গদোষে পড়ে খুন করেছে, তাদের সুস্থ সমাজে ফেরার একটা সুযোগ দেওয়া উচিত ইত্যাদি। তাদের এসব যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই তা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা উপরিউক্ত রায়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অনেকে বলেন যে, মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকলেও খুন বন্ধ হবে না। হ্যাঁ তা ঠিক। সমাজ থেকে খুন একেবারে বন্ধ হবে না, তবে এখন যে পাইকিরি হারে খুন চলছে তা অবশ্যই বন্ধ হবে। খুনের সংখ্যা অন্তত ৯০ শতাংশ কমে আসবে। খুনিরা হত্যাকাণ্ড চালানোর আগে দশ বার ভাববে যে খুন করলে আর রেহাই মিলবে না, তাকেও ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে, খুনিদের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হবে, যার ফলে খুনের সংখ্যা অবধারিত ভাবে কমে আসবে।

এই প্রসঙ্গে, সুপ্রিম কোর্ট প্রাণদণ্ড বহাল রাখার পরে খুনি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায়। হায়! সে যখন নৃশংস বর্বরতার সঙ্গে খুন করে কারও প্রাণ কেড়ে নয়, তার শিকার তাকে প্রাণপণে বাধা দেয়, কিংবা তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায় তখন তো আর বিবেক বিন্দুমাত্র জাগে না। সে চরম নৃশংসতার পরিচয় দিয়ে তার দুষ্টকর্ম অর্থাৎ খুন চালিয়ে যায়। সেই আবার প্রাণভিক্ষা চায়। তাই এই প্রাণভিক্ষার আবেদন সম্বন্ধে কিছু কড়াকড়ি বাঞ্ছনীয়। একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদন দিলেই তবেই রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করা যেতে পারে।

পরিশেষে, খুন হওয়া ব্যক্তির পরিবারের হতভাগ্য মা-বাবা, বৌ-ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিকট আত্মীয়রা যে শোচনীয় অবস্থায় পড়েন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পরে গোটা পরিবার অগাধজলে পড়ে যায়। তাদের অন্নসংস্থান বন্ধ হয়ে যায়। এরকম অবস্থায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এইসব হতভাগ্য পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। কিছু এককালীন ও মাসিক সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। দরকার হলে খুনির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার থেকে সাহায্য করা যেতে পারে।

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর
‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

রামায়ণের ঐতিহাসিক প্রমাণে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনমানসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রামকথা। ত্রেতাযুগে লিখিত আদিকবি বাল্মীকি মুনির রামায়ণ এতগুলো বছর পেরিয়েও প্রাচীন ভারতীয় তথা বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় অমলিনতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, দেবী সীতা, ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভক্ত হনুমান আজও ভারতবাসীর কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় চরিত্র। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Rama, the ancient idol of the heroic ages, the embodiment of truth, of morality, the ideal son, the ideal husband, the ideal father and above all, the ideal all, the ideal king, the Rama has been presented before us by the great saint Valmiki." এই ক্ষাত্রতেজ সম্পন্ন, আদর্শ চরিত্রবান শ্রীরামের পদধূলিতেই ধন্য হয়েছে দেবভূমি ভারত। এতগুলো বছর পেরিয়ে আজও ভারতবর্ষের প্রকৃতি বহন করে চলেছে শ্রীরামের উপস্থিতির স্বাক্ষর। শুধু ভারত নয়, প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা অর্থাৎ প্রাচীন সিংহলেও মেলে শ্রীরামের উপস্থিতির প্রমাণ, দেবী সীতার অশোকবনে বন্দী থাকার প্রমাণ, রাম-রাবণের যুদ্ধের প্রমাণ। কিন্তু হাজার বছরের ইসলামি শাসন ও আড়াইশো বছরের ব্রিটিশ আধিপত্যে ভারতের সাধারণ মানুষকে 'intellectual elit class' ভুলিয়ে দিয়েছে সেই শিকড়ের স্বরূপ। যার ফলে রামায়ণ, মহাভারতের মতো প্রাচীন ভারতের ইতিহাসগুলো ভারতের মাটিতেই যুগপ্রাচীন সনাতন ঐতিহ্য সম্পর্কে উদাসীন ভারতীয়দের কাছে হয়ে উঠেছে নিছকই গল্পগাথা। সেখানে শ্রীরাম-সহ সমগ্র রামায়ণের চরিত্রগুলো ব্যাখাত হয়েছে কাল্পনিক চরিত্ররূপে। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ দাবি করেছেন, 'Infact the Ramayana and the Mahabharata are the encyclopaedias of ancient Aryan life and wisdom, portraying an ideal civilization which humanity has to aspire after." সমগ্র রামায়ণ অধ্যয়ন করে পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ ম্যাকডোনাল বলেছেন, "Probably no work of world Literature, secular in its origin has ever produced so profound an influence on the life and thought of a people as the Ramayana." অথচ ভাগ্যের এমনই পরিহাস আমাদের দেশের 'সেকুলার'-দের কাছেই এই ঐতিহাসিক বীরগাথা ব্রাত্য।

রামচরিত্র কাল্পনিক নাকি ঐতিহাসিক— তা নিয়ে বহু চর্চা ও বিতর্ক ভারতীয় সমাজে রয়েছে। তবে রামায়ণ সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা রামায়ণের ঐতিহাসিক যথার্থ্যতারই সাক্ষ্য দেয়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ পেশের আগে একটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন যে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে রাম ও সীতার চরিত্রদুটিকে উপস্থাপন করেছিলেন আদর্শ নর ও নারী রূপে। কিন্তু পরবর্তীকালে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস', তামিল কবি কম্বমের 'কম্ব রামায়ণ', এড়ুথাচানের 'আধ্যাত্ম রামায়ণ', 'রঙ্গনাথ রামায়ণ'-এ শ্রীরামচন্দ্রের উপর অবতারত্ব আরোপ করা হয়েছে।

যাইহোক, সম্প্রতি জীনতত্ত্ব বিষয়ক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে রামায়ণে বর্ণিত বানরকুল ও রাক্ষস নেহাতই বানর বা রাক্ষস নয়, তারা ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী। আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে রামায়ণে উল্লিখিত বানর, রাক্ষস আসলে নিয়ানডারথাল এবং হোমিনিড প্রজাতিভুক্ত। রামায়ণে কখনও 'বানর' বলতে 'বাঁদর' বোঝানো হয়নি। 'বানর' শব্দটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বানর শব্দটি 'বন' ও 'নর' শব্দদ্বয়ের যুক্তরূপ যার অর্থ বনে থাকে যে নর অর্থাৎ মানুষ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিয়েনডারথাল প্রজাতির বাসস্থান ইউরোপ, আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়া হলেও সিন্ধু সভ্যতাতেও এই প্রজাতির উপস্থিতির কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেহেতু ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই মৃতদেহ দাহ করার প্রথা প্রচলিত, তাই বেশি সংখ্যায় এই প্রজাতির কঙ্কাল পাওয়া যায় না। সম্প্রতি এস্টোনিয়ার

এস্টোনিয়ান বায়োসেন্টারের জিনতত্ত্ব বিষয়ক গবেষক ড. জ্ঞানেশ্বর চৌবে-সহ একদল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জিনতত্ত্ব বিশারদ, নৃতত্ত্ববিদ্‌, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা তথ্যপ্রমাণ-সহ দাবি করেছেন, "...Ramayana, written 10,000 years ago, is a chronicle of events and characters recorded by Sage Valmiki and not a work of fiction." (তথ্যসূত্র : The Pioneer 15 June, 2015)। ড. চৌবে এবং হায়দ্রাবাদের সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি, 'দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়', 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি' খড়্গাপুর এবং ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ অন বেদাস' (vedas)-এর গবেষকগণ বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে ভারতে কোল, ভিল, গোণ্ড নামক যে প্রাচীন জনগোষ্ঠী রয়েছে তারা আসলে রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রগুলির উত্তরপুরুষ। তাদের এই বিষয়ক দীর্ঘ গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটি 'Plos One' নামক বিখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক পোর্টালে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে উন্মোচিত হয়েছে যে রামসেবক কোল নামে কোল উপজাতির একজন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের সিদ্ধি জেলায় যিনি রামায়ণের রাজা গুহের একজন অন্যতম উত্তরপুরুষ। 'দ্য পাইওনীয়ার'-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ড. চৌবে জানিয়েছেন, "Guha, the Nishad King, is the ancestor of the present day Kol tribe we found in these regions. This ancestry was established by genetic studies. These group of people carry the basic indigenous genetic traits of India. Ramsevak and thousands like him spread acrose the states of UP, MP, Odisha, Chattisgarh are the true descendants of Lord Rama and his contemporaries."

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, নিষাদরাজ গুহের উত্তরপুরুষরা মূলত এখনও উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর, বারাণসী, বান্দা এবং এলাহাবাদ অঞ্চলেই রয়েছেন। এমনকী কোনো কোনো গবেষক দাবি করেছেন রামায়ণের জাম্বুবান ভল্লুক জাতীয় কোনো প্রাণী হতে পারে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ভি. আর. রাও বলেছেন, "King Dasaratha, Rama and others were not fictional characters।" বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ড. এস কল্যাণারামণ, ড. চৌবে ও তাঁর দলের রামায়ণের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "This paper by Gyaneswer Chaube and team is an attempt to explain the roots of Hindu civilisation which has been distorted by creating false ethnic indentities by the categorisation of people."

শুধু নৃতত্ত্ব নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাতেও প্রমাণ হয়েছে যে রাম একজন ঐতিহাসিক চরিত্র। ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল রাজাগোপালচারী বিখ্যাত বৃটিশ ভারততত্ত্ববিদ স্যার উইলিয়াম জোনস্‌, ফিলিপ লাটজেনডরফ, ল্যারি সিয়ারস, ডব্লু এল স্মিথ প্রমুখ তাঁদের গবেষণামূলক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শ্রীলঙ্কা ও ভারতজুড়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থলগুলি হলো— (ক) শ্রীলঙ্কার 'কোবরা-হুডেড কেভ'। অনুমান করা হয় এইখানে সীতা দেবীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এই গুহার ছাদে কিছু প্রাগৈতিহাসিক অঙ্কন পাওয়া গেছে, (খ) নুয়ারা এলিয়া, অশোক বটিকা-সহ শ্রীলঙ্কার বহু মন্দিরে হনুমানের পদচিহ্ন পাওয়া গেছে, (গ) হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্বত আনছিলেন তখন তার থেকে কিছু টুকরো সমুদ্রের জলে পড়লে সেখানে সেই টুকরোগুলোই সঞ্জীবনী পর্বতরূপে এখনও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে, (ঘ) অযোধ্যার হনুমানগড়, (ঙ) নেপালের জানকী মন্দির, (চ) অন্ধ্রপ্রদেশের লেপক্ষী— এইস্থলে জটায়ু রাবণের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পতিত হয়েছিলেন, (ছ) শ্রীলঙ্কার কোণেশ্বরম মন্দির। (জ) ওই মন্দির সংলগ্নই কান্নিয়া উষ্ণ প্রস্রবণ, (ঝ) সীতা কটুয়া— রাবণ সর্বপ্রথম সীতাকে এখানেই এনেছিলেন, (ঞ) অশোক বাটিকা, (ট) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হলো রামসেতু।

নাসা শাট্‌ল থেকে প্রাপ্ত ভারত-শ্রীলঙ্কার মাঝে ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ যে পাথুরে সেতুটি আছে সেটি অধুনা প্রমাণিত হয়েছে মনুষ্যনির্মিত এবং নাসাও এই দাবিটিকে মান্যতা দিয়েছে। নন্দিতা কৃষ্ণান বলেছেন, "Why doubt the connections between Adam's Bridge and Rama, when nobody else in Indian History has claimed its construction?" (ঠ) ১৯৭৫ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এ এস আই) অযোধ্যায় বাবরি ধাঁচার কাছেই চোদ্দটি স্তম্ভবিশিষ্ট কষ্টি পাথর খনন করে বের করেছে, যেটি শ্রীরামের জন্মস্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। (ড) লুম্বিনি উদ্যানে সম্রাট অশোক নির্মিত একটি স্তম্ভ আছে যেটি রামসীতার বিবাহের পর সেই উদ্যানের মধ্য দিয়ে মিথিলা ত্যাগ করে অযোধ্যায় যাওয়ার স্মৃতিস্মারক রূপে বিরাজ করছে। এছাড়াও সীতার অগ্নিপরীক্ষার স্থান, রাম-রাবণের যুদ্ধস্থল-সহ অনেক স্থানই অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

রামায়ণে তিথি, নক্ষত্র ও রামের পদযাত্রার পথ এত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে আজও সেগুলি চিহ্নিত করতে কোনো অসুবিধা হয় না। শ্রী ভিডি রামস্বামী 'Sri Rama Pada Yatra' নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন যেখানে শ্রীরামের পদধূলিধন্য স্থানগুলি মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও মেজর ফোর্বস তাঁর 'Eleven Years in Ceylon' গ্রন্থে রামায়ণের কাহিনি অনুসারে শ্রীলঙ্কার অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে সেখানকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিক ড. রাম অবতারের 'জাঁহা জাঁহা রাম চলে জাঁহা' বইটিও ইতিহাসের এক প্রামাণ্য নথি। এটা স্পষ্ট যে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার লেবেল আঁটানো ঐতিহাসিকেরা যতই রামায়ণকে কল্পকাহিনির তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করুন করেন না কেন বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ কখনও মিথ্যা বলে না।

অন্য রকম

‘প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিতে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পাওয়া যায়’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ *দয়াল সিংহ পাওয়ার জন্মান্ধ। তা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে অসংখ্য অন্ধ ছেলেমেয়ের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি নিজেই জানালেন—*

‘আমি জন্মান্ধ। পড়াশুনার জন্য সাত বছর বয়সে দিল্লী এসেছি। দিল্লীতে লেখাপড়া শিখে আজ আমি লালবাহাদুর সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে শিক্ষক রূপে কর্মরত আছি। অন্ধ হলেও আমি তা নিয়ে কোনো চিন্তাই করিনি। পড়াশুনা করার সময় আমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলাম যে, অন্ধ ছেলেমেয়েদের জন্য আমাকে কিছু করতে হবে।

আমার বড়দা আনন্দ সিংহও জন্মান্ধ ছিলেন। গ্রামে অন্ধ ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তিনি দিল্লী এসেছিলেন। এখানে এসে তিনি জানতে পারেন যে, দিল্লীতে অন্ধ ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বিশেষ বিদ্যালয় আছে। দাদাই আমাকে দিল্লীতে ডেকে নেন। আমি উত্তরাখণ্ডের গ্রাম থেকে দিল্লীতে এসে নিজামুদ্দিনের কাছে ‘জে পি এম সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ড’-এ ভর্তি হই। এখান থেকে বারোক্লাস পাশ করি। সেন্ট স্টিফেনস্ কলেজ থেকে সংস্কৃতে বিএ এবং পরে এমএ পাশ করি। তারপরই বিএড করি। কিছুদিন সরকারি চাকরিও করেছি। কিন্তু আমার শিক্ষকতা করার ইচ্ছা থাকায় ২০০৪ সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রী সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে শিক্ষক রূপে যোগ দিই।

আমি অন্ধ ছাত্রছাত্রী ছাড়াও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত পড়াই। আমার পছন্দের বিষয় অঙ্ক ছিল। কিন্তু সামর্থ্য না থাকায় সংস্কৃত নিয়েই পড়াশুনা করেছি। এখন আমি ‘সক্ষম’— ‘সমদৃষ্টি সেবা, ক্ষমতা বিকাশ এবং অনুসন্ধান মণ্ডল’-এ যুক্ত হয়ে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের বিকাশের জন্য কাজ

দয়াল সিংহ পাওয়ার

করছি। আমার গ্রাম বুরাড়ীতে দাদার স্মৃতিরক্ষায় ‘আনন্দ সিংহ স্মারক খেল এবং সাংস্কৃতিক সমিতি’ গঠন করেছি। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের রাজ্যস্তরে নানা প্রকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। প্রতিযোগিতায় অন্ধ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সাধারণ ছেলেমেয়েদেরও রাখা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো— অন্ধ ছেলেমেয়েরা সাধারণ ছেলেমেয়েদের প্রতিযোগিতায় জিতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হবে। প্রতিযোগিতায় দাবা, বক্তৃতা, নিবন্ধ লেখা, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক বিষয় থাকে।

আমার অন্ধ ছাত্রদের মধ্যে অনেকে শিক্ষক হয়েছে। কেউ কেউ কলেজে অধ্যাপনাও করছে। আমি যদি জানতে পারি যে, কোনো অন্ধ ছেলে বা মেয়ে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন অথবা সংস্কৃত বিষয়ে দুর্বল, তৎক্ষণাৎ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যাই। যেভাবে আমি গ্রাম থেকে রাজধানী শহরে এসে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছি, আমি চাই যে কোনো অন্ধ বা বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়ে সেই সুযোগ পাক। এরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে নিজের পায়ে দাঁড়াক এটাই আমার লক্ষ্য। এ বিষয়ে আমি সব সময় সজাগ থাকি।

আমার দাদা আমাকে পড়াশুনার প্রেরণা দিয়েছিলেন। পড়ার সময় আমার মনে হয়েছিল পড়াশুনা করে বড় হওয়া যায়। ছাত্রজীবনেই আমি স্থির করেছিলাম শিক্ষক হোব। অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের প্রতি আমার বার্তা— ‘প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিই শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে পারে।’ ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

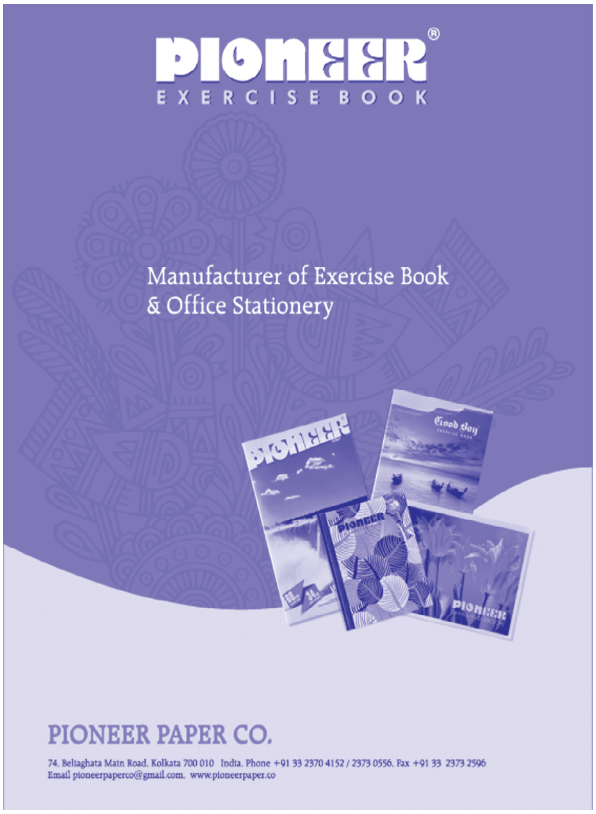

'নারীকে নিঃসন্দেহে সকল কার্যে নিপুণা হতে হবে। এইভাবে জীবনে যে কোনো অবস্থায় সমান দক্ষতা লাভ, পত্নীত্বের পূর্বে নারীত্ব এবং নারীত্বের পূর্বে মানবত্বে আরূঢ় হবার বৈশিষ্ট্য অর্জন— প্রত্যেক যুগে নারীশিক্ষার লক্ষ্য বলে গণ্য হওয়া উচিত।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

প্রাকৃতিক চিকিৎসা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি

সুভাষ মণ্ডল

প্রাকৃতিক চিকিৎসা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসাপদ্ধতি। এই চিকিৎসার উদ্ভাবন কিছু ধর্মীয় গ্রন্থের সূত্র অবলম্বন করেই। আয়ুর্বেদ যেমন অথর্ব বেদকে কেন্দ্র করে, তেমনই ভারতে কৃত সাধনার উচ্চস্তরে উন্নীত কোনো এক সাধকের গ্রন্থের কিছু সূত্রকে অবলম্বন করে প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়। ভারতেও আজ বহুল পরিমাণে এই চিকিৎসা প্রচলিত।

দীর্ঘ গবেষণালব্ধ ফল থেকে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারা যায় যে, এই চিকিৎসা সম্পূর্ণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াহীন এবং অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতি থেকে দ্রুত রোগ নিরাময় হয় ও রোগী আরোগ্য লাভ করে। চিকিৎসা-জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলের আবেদন, জগতের কল্যাণে ব্যয়বহুল পাশ্চাত্য চিকিৎসার জটিল পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে এই সহজ পন্থায় চিকিৎসা শুরু করলে অন্ততপক্ষে চিকিৎসকদের অর্থ পিপাসু দুর্নামটা মুছে যাবে।

অধ্যাপক এলোনজো ক্লার্ক, এম. ডি. বলেছেন, 'আমাদের সকল আরোগ্যকারী ওষুধই বিষ। ফলস্বরূপ ঔষধের প্রত্যেক মাত্রা রোগীর জীবনীশক্তি ক্ষয় করে [F.E. Bibz-The Natural Method of Healing p. 984]। হোমিওপ্যাথিক দর্শনের প্রণেতা কান্ট বলেছেন, 'That what is prone to cure, is prone to kill অর্থাৎ রোগ আরোগ্য করতে পারে, আবার তা মানুষ মারতেও পারে। ভারতে এই চিকিৎসার অন্যতম প্রবক্তা গান্ধীজির আক্ষেপ (Guid to health, p. 5) — বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগীর মৃত্যু হারকে কেন্দ্র করে— 'পৃথিবীতে এত ডাক্তারেরা যত লোক মেরেছে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী একত্রে তত লোক মারতে পারেনি (ডাঃ মেসত গুড)। তখন আমরা তার কোনো প্রতিবাদ করতে পারি না।

সুতরাং সকলের সাবধান হওয়া উচিত, সিদ্ধান্ত নিতে হবে 'বাঁচার জন্য বিষ গলাধঃকরণ', না বিষহীন জীবন-যাপন! প্রাকৃতিক চিকিৎসা মতে রোগ একটাই— 'দেহের যে দূষিত অবস্থা সেটি দূর করার জন্য দেহ প্রকৃতির যে বিভিন্ন চেষ্টা তার নাম যোগ। আর বিনা ওষুধে সাধারণভাবে কিছু পথ্য, জল, মাটি, উত্তাপ, হাওয়া, আলো, ব্যায়াম, মালিশ, যোগাসন, প্রাণায়াম, উপবাস, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্রাম প্রভৃতির সাহায্যে আভ্যন্তরীণ অতিরিক্ত দূষিত অবস্থাকে মুক্ত করে দেওয়ার পদ্ধতিকে প্রাকৃতিক চিকিৎসা বলা হয়। ছবিতে এক সাধারণ গৃহিণী ঘরেই সর্দি কাশিতে আক্রান্ত নিজের ৩ বছর ৮ মাসের শিশুকে চিকিৎসা করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই শিশু সরকারি টিকাকরণ ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনো ডাক্তারের ঔষধ সেবন করেনি। পর্যায়ক্রমে বুক, পেট ও পায়ে পটি দিয়ে শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে।

বুকে পটি বাঁধা হচ্ছে (উপরে)। (নিচে) দু মিনিট গরম সেঁক দেওয়ার পর ১ মিনিট ঠাণ্ডা সেঁক দেওয়া হচ্ছে।

অনেকে বলতে পারেন সব চিকিৎসাই প্রাকৃতিক চিকিৎসা, কারণ প্রকৃতি হতেই সবকিছুর সৃষ্টি। তবে যা কিছু সেবনে দেহ মন্দিরের ক্ষতি হয় যা দেহ-প্রকৃতির স্বভাব বিরুদ্ধ, তাকে আমরা প্রাকৃতিক বলতে পারি না। ক্ষেত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞগণ বলে থাকেন যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। এক্ষেত্রে মনে হয় প্রাকৃতিক চিকিৎসার অপর নাম বিষহীন প্রাকৃতিক চিকিৎসা হওয়া উচিত। এই চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না এমন রোগ ও রোগী খুব কমই আছে। বিভিন্ন জ্বর থেকে শুরু করে সর্দি, কাশি, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া বিভিন্ন চর্ম রোগ, পাকস্থলীর বিভিন্ন গলোযোগ, জননেন্দ্রিয়র রোগ প্রভৃতি যেমন দ্রুত আরোগ্য হয়; বিভিন্ন স্তরের ক্যানসার (কর্কট) রোগীরাও দীর্ঘ-জীবন লাভ করতে পারেন প্রাকৃতিক যোগ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ করে।

পশ্চিমবঙ্গের জোকা, হাওড়ার ইরিম, কেন্দ্র সরকারের আয়ুস, মধ্যপ্রদেশের সাগর এবং ব্যাঙ্গালোরে প্রাকৃতিক চিকিৎসার ভালো ভালো কেন্দ্র রয়েছে। অন্যান্য চিকিৎসায় রোগ সারার পর দেখা যায় রোগী অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পুনরায় ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক চিকিৎসায় একবার রোগ সারার পর এবং চিকিৎসকদের দেওয়া খাদ্যের বিধান ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় পরামর্শ মেনে চললে সাধারণত কোনো চিকিৎসার সম্মুখীন হতে হয় না। যেহেতু প্রাকৃতিক চিকিৎসা স্বাস্থ্য বিধির এই সূত্র মেনে চলে' তাই Protection is better than cure।

(লেখক প্রাকৃতিক ও যোগ চিকিৎসা গবেষক)

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি-র প্রশিক্ষণ শিবির

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের ১৫ দিনের গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ বর্গ গত ৫ জুন থেকে জলপাইগুড়ি শহরের পাণ্ডাপাড়াস্থিত সারদা শিশুতীর্থ পরিসরে গত ৫ জুন থেকে শুরু হয়ে ২০ জুন বিকেলে সমারোপ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। বর্গে উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার (উত্তর মুর্শিদাবাদ সহ) ১৪ স্থান থেকে ৫৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার, সম্ভাগ প্রচারিকা জয়া ভট্টাচার্য। এছাড়া ৫ জন শিক্ষিকা। চারজনেই অন্য প্রদেশ থেকে আগতা। উত্তরবঙ্গের কালিয়াগঞ্জ শাখার ইন্দ্রানী বিশ্বাস সহ-শিক্ষিকা ছিলেন। কলকাতার সাবিত্রীদেবী কাজরিয়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে গত ২৫ থেকে শুরু হয়ে ৮ জুন পর্যন্ত চলে দক্ষিণবঙ্গের সেবিকা সমিতির শিক্ষাবর্গ। শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫৭ জন। এর মধ্যে প্রবেশ ৪৭ এবং প্রবধ ১০ জন। জেলানুযায়ী সংখ্যা ছিল— মালদা ৪, মুর্শিদাবাদ ২, বীরভূম ৭, বাঁকুড়া ১, পুরুলিয়া ৭, নদীয়া ২, হাওড়া ১, হুগলী ২, উত্তর চব্বিশ পরগনা ৪, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ১৯, পূর্বমেদিনীপুর ১, পশ্চিমমেদিনীপুর ২ এবং কলকাতা ৫। শিক্ষিকা হিসেবে ছিলেন ত্রিপুরা সম্ভাগ প্রচারিকা রূপালী দত্ত, মণিপুর বিভাগ শারীরিক প্রমুখ জ্ঞানেশ্বরী শিবা, দক্ষিণ অসম প্রান্ত প্রচারিকা সুপর্ণা দে এবং মহারাষ্ট্র থেকে আগত নয়না। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রমুখ চিত্রা যোশী। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী গবেষিকা পূরবী রায়।

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৭ জুন সকাল ১০ টায় কলকাতার কেশব ভবনে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক প্রবীণ প্রচারক কেশব দীক্ষিত। বিভিন্ন জেলা ও শাখা থেকে আগত ৮৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সাধারণ সভার কাজ শুরু হয়। অখিল ভারতীয় নাট্য প্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য, গুরু বিশ্বাস, সুভাষ ভট্টাচার্য ও সংস্কার ভারতীর প্রমুখ অধিকারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৫-১৬ সালের কার্যকরী সমিতির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক, সংগঠন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হন যথাক্রমে তপন গাঙ্গুলী, শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, ভরত কুণ্ডু ও গোপাল কুণ্ডু। মুখ্য উপদেষ্টা ভিক্টর ব্যানার্জী ও কার্যকরী উপদেষ্টা হিসাবে সুভাষ ভট্টাচার্যের নাম ঘোষিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অশোক তিওয়ারী উপস্থিত ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয় বিকেল ৪টায়।

সমাবেশ সমাচার

বিবেকানন্দ কেন্দ্র সিউড়ী শাখার সভা

"শুধুমাত্র অন্ন, বস্ত্র, ওষুধপত্র দান করে মানুষের সাময়িক প্রয়োজন মেটানো যায় কিন্তু তাতে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তুলতে না পারলে সেই মানুষ সারাজীবন পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে"--- বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারীর সিউড়ী শাখার উদ্যোগে 'জীব সেবাই শিব সেবা' শীর্ষক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন কেন্দ্রের সর্বভারতীয় সহ-সভানেত্রী নিবেদিতা ভিড়ে। তিনি বলেন, বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সেবা প্রকল্পগুলির লক্ষ্য থাকে মানুষকে স্বাবলম্বী করে স্থায়ী উন্নতি করার।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারীর প্রতিষ্ঠাতা একনাথ রানাডের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সিউড়ী ডি. আর. ডি. সি. সভাগৃহে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিপিন কুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সিউড়ী শাখার সংযোজক তথা সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল। বিশিষ্ট শিল্পী প্রীতিকণা ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় সিউড়ী সুর নিকেতনের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

বিবেকানন্দ কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সংগঠক মনোজ দাস, ব্যবস্থাপ্রমুখ প্রদীপ জয়সোয়াল ও একনাথ রানাডে জন্মশতবর্ষ কার্যক্রমের সংযোজক কিংশুকপল্লব বিশ্বাস কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কার ভারতীর রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

গত ২৬ মে সংস্কার ভারতী দক্ষিণ কলকাতা শাখার উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সম্পাদিকা নীলঞ্জনা রায়। অনুষ্ঠানে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা নৃত্যগীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন।

বিশ্ব যোগ দিবস উদযাপন

গত ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবসে বিবেকানন্দ পাঠচক্র ও সংস্কার ভারতী যৌথভাবে ৫০, বলদেও পাড়া রোডস্থ সংস্কার ভারতীর প্রদেশ কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় এক আলোচনা সভা ও যোগ অনুশীলনের আয়োজন করে।

শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন যোগ অভ্যাস করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং উপস্থিত সকলকে যোগ অভ্যাস করান বিবেকানন্দ কেন্দ্রের কার্যকর্তা বিকাশ জয়সোয়াল।

***

এদিন বিকেল ৪টে থেকে ৫টা পর্যন্ত সংস্কার ভারতী বেহালা শাখা, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি ও ভাজপা মহিলা মোর্চার যৌথ উদ্যোগে ধ্যান ও যোগ অনুশীলনের আয়োজন করে। নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমতী শুভ্রা দে ও শ্রীমতী প্রতিভা বিস্ট। স্থির হয় প্রতি চতুর্থ শনিবার ধ্যান ও যোগের চর্চা করা হবে।

***

নদীয়ার করিমগঞ্জের জয়নাবাদ গ্রামে পতঞ্জলি যোগাশ্রমের উদ্যোগে ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। ভোর ৬টা থেকে যোগ ব্যায়ামের জন্য আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রায় ১ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হরিদ্বার থেকে আগত যোগের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীগুণধর। এই আশ্রমে প্রতিদিনই সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত যোগচর্চা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও উপস্থিত ছিলেন।

'শ্রদ্ধা'র ৬৬তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অকালেই চলে গেলেন সিউড়ী শাখার মুখ্য শিক্ষক বিক্রম নন্দন

গত ৯ জুন অকালেই চলে গেলেন বিক্রম নন্দন। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই জীবনের শেষ। সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে। কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ফর্ম তুলতে যাওয়ার

পথে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় কেড়ে নিল তাঁর জীবন। সদাহাস্য, ছটফটে বিক্রম শিশু বয়স থেকেই সিউড়ী হরিগোপাল কলোনির রাণাপ্রতাপ শাখার স্বয়ংসেবক। মাধ্যমিক দিয়ে পার্শ্ববর্তী মাধাইপুর গ্রামে একমাস বিস্তারক থাকেন এবং প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ সমাপ্ত করেন। বর্তমানে দায়িত্ব ছিল ওই শাখার মুখ্যশিক্ষক। এইবছরও উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে ওড়িশায় অনুগুলে দ্বিতীয়বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ সমাপ্ত করেন। শারীরিক ও ঘোষে বিক্রমের পারফরমেন্স ভালো ছিল। আনক বাদক হিসাবে অগ্রণী ভূমিকায় থাকতেন। বিক্রমের সম্পূর্ণ পরিবার সঙ্ঘানুরাগী— মা, বাবা, বিক্রম ও বোন। মা ও বোন সেবিকা সমিতির শাখায় যান। সহ সরকার্যবাহ ভাগাইয়াজীর সিউড়ী প্রবাসকালে বিক্রমের পরিবারের সকলে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। এই রকম প্রকট সুখী ও সম্ভাবনাময় পরিবারে একটি দুর্ঘটনা অন্ধকার নিয়ে আসে। বিক্রম ছিল অন্তত পরোপকারী, মিশুকে এবং খুব হাসিখুশি— সকলের প্রিয়পাত্র। মাত্র ১৮ বছরের সেই প্রভাব বোঝা গেল তাঁর মৃত্যুর পর। কোনো শববাহী গাড়ি নয়— বাড়ি থেকে প্রিয় সঙ্ঘস্থান হয়ে সঙ্ঘকার্যালয় 'কেশব তীর্থ'— দুই কিলোমিটার রাস্তা প্রায় একশত যুবক পায়ে হেঁটে চললো তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে। সঙ্ঘকার্যালয়ে প্রমুখ কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা আত্মার শান্তি কামনা করে। পরে তিলপাড়া শ্মশানে দাহ করা হয়।

বিক্রমের এই অকাল প্রয়াণে পরিবার তথা সঙ্ঘক্ষেত্রে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। বাড়িতে এসে সমবেদনা জানিয়ে আসেন প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় ও জেলা স্তরের কার্যকর্তারা।

বিশ্ব যোগ দিবসে শেওড়াফুলিতে চলছে যোগ অনুশীলন।

হুলগী।

মালদার কাঞ্চনতার।

মঙ্গলনিধি

মালদহ জেলার গাজোলের 'ধূলিকণা' আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্ণধার স্বপন চক্রবর্তী ১৪ জুন তাঁর নবনির্মিত বাসভবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে মালদহের স্বস্তিকার কার্যকর্তা শ্রী পরেশ চন্দ্র সরকারের হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। শ্রী সরকার সেই নিধি মালদা জেলা সেবাভারতীকে সেবাকাজের জন্য অর্পণ করেন।

***

আন্দামানের দিল্লী গ্রাউন্ড শাখার স্বয়ংসেবক অরবিন্দ নন্দীর শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ২৪ মে তাঁর বাবা হরিদাস নন্দী মঙ্গলনিধি প্রদান করেন উত্তর-মধ্য আন্দামান জেলা কার্যবাহ বিকাশ মণ্ডলের হাতে। শ্রী মণ্ডল আন্দামান সেবা ভারতীকে সেই নিধি সেবাকাজের জন্য অর্পণ করেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলার বৌদ্ধিক প্রমুখ সৌমেন্দ্রনাথ দাস তাঁর গত ১০ মে তাঁর শাশুড়িমাতার শ্রাদ্ধবাসরে শ্রদ্ধানিধি প্রদান করেন তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির তহবিলে। শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক রুধিররঞ্জন নায়ক, জেলা প্রচারক অর্জুন বিশ্বাস-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মধ্যভাগ কার্যবাহ সুরেন ঠাকুরের পিতা শুকদেব ঠাকুর গত ১২ জুন বিহারের বৈশালীতে নিজ আবাসে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রঙ্গত শাখার স্বয়ংসেবক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্দামান প্রান্তের সেবা প্রমুখ শুভাশিস দেবনাথের মাতৃদেবী জীবনরানী দেবনাথ গত ২৭ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ৭ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, শুভাশিস দেবনাথের মা পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলার নবদ্বীপধামে থাকতেন। নবদ্বীপধামের বাড়িতেই তিনি পরলোকগমন করেন।

বোমা নাটকে এক স্বল্পালোচিত সময় পর্বকে প্রায় প্রামাণ্য কালখণ্ডের স্তরে নিয়ে গেছেন ব্রাত্য

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের সম্ভার কোনোদিনই দীন ছিল না। নাটকের সূচনা লগ্ন থেকেই তখনকার প্রবাদপ্রতিম নাট্যকাররা বিভিন্ন সামাজিক নাটকের সঙ্গে বাধ্যতামূলক ভাবেই তাদের নাট্যাবলীর মধ্যে কিছু না কিছু ঐতিহাসিক নাটক রেখে গেছেন। প্রথমেই নাট্যাচার্য গিরিশ কুমার ঘোষের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ‘সিরাজদ্দৌল্লা’ নামের অবিস্মরণীয় নাটকটির কথা মনে আসবে। আমরা কেউই এই ঐতিহাসিক ঘরানার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান প্রভৃতি নাটকগুলি বয়সের কারণে দেখার সুযোগ পাইনি। কিন্তু বেতার মারফত বিভিন্ন তৎকালীন প্রসিদ্ধ অভিনেতা/অভিনেত্রীদের নানান ঐতিহাসিক নাটকের সম্প্রচারের সুবাদে আমাদের ঐতিহাসিক নাটকের ধারাকে কখনই রুদ্ধ হতে দেয়নি। আজকাল বেতারে ঐতিহাসিক নাটকের সম্প্রচার কতটা হয় সে সম্পর্কে জানা নেই। তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের অনবদ্য নিয়ন্ত্রণে একসময় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, সরযূবালা থেকে ছবি বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দিকপাল শিল্পীরা কায়াহীন অবস্থায় যে অদৃশ্য শ্রুতিনাটক (যার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক নাটকও ছিল) লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে উপহার দিয়ে গেছেন, সে আনন্দ থেকে আজকের তরুণ নাট্যপ্রেমীরা চিরবঞ্চিতই রয়ে গেলেন।

সম্প্রতি সুরজিত বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে সিরাজদৌল্লা নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। ঐতিহাসিক নাটক সুঅভিনীত ও সুপরিচালিত হলে যে আজও মানুষকে আকর্ষণ করে সুরজিতের নাটক সে প্রমাণ রেখেছিল। এই পরিমণ্ডলেই প্রায় বছর দুই আগে প্রখ্যাত নাট্যকার ব্রাত্য বসু তাঁর বিতর্কিত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব দেবব্রত (জর্জ) বিশ্বাসকে নিয়ে ‘রুদ্ধসঙ্গীত’ নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। প্রাক্ স্বাধীনতা ও সদ্য স্বাধীনোত্তর বাংলা ও তৎকালীন আই পি টি এ (ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার)-এর সঙ্গে নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও তৎসংক্রান্ত তীব্র হতাশাবিদ্ধ প্রতিভাবান দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনকেন্দ্রিক এই ঐতিহাসিক নাটক অকুণ্ঠ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আজও মাঝে মধ্যে নাটকটি অভিনীত হয়।

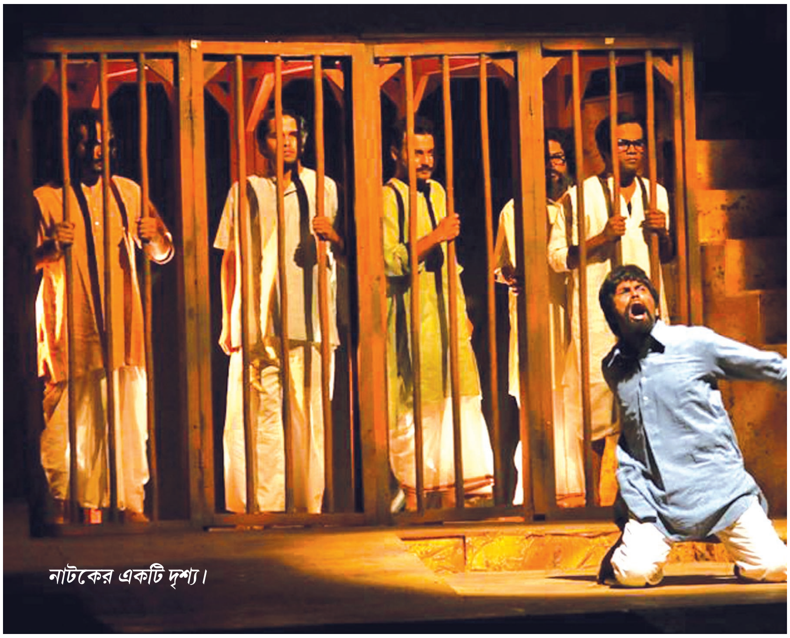

নাটকের একটি দৃশ্য।

ব্রাত্য তাঁর ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রবণতা থেকে যে সরে আসেননি তার ফলে লাভ হয়েছে নাট্যমোদীদেরই। ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্র বরাবরই নানান কালপর্বে তার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা (interpretation) নিয়ে দর্শকের দরবারে আসে। অনেক সময়ই নতুন প্রজন্ম যে সমস্ত অতীত ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে অজ্ঞ বা উদাসীন, তাদের চরিত্রের অজানা ঐতিহাসিক তথ্যগুলি নাটকের মোড়কে পরিবেশিত হলে বিনোদন ও শিক্ষা দু’টি কাজই এক সঙ্গে হতে পারে। ঠিক এই কাজটাই করেছেন কুশলী ব্রাত্য। শ্রী অরবিন্দকে গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষই ‘Life Divine’ বা ‘Sabitri’-র মতো কঠিন আধ্যাত্মিক সাধনার বইয়ের লেখক ও এক দিব্যজীবনের অধিকারী বলেই জানতে অভ্যস্ত। তরুণ প্রজন্মের অনেকেই পণ্ডিচেরী বেড়াতে গিয়ে তাঁর আশ্রম ঘুরে দেখে বোঝার থেকে অনেক কিছু না বুঝেই চলে আসেন। এই আধ্যাত্মিক পণ্ডিচেরী বাসের আগে অরবিন্দ যিনি লন্ডনে শিক্ষালাভের সুবাদে কৈশোরে Advoid Ghosh নামধারী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর বিক্ষুব্ধ পূর্বাশ্রমের কথা নিয়েই জমজমাট নাটক ‘বোমা’। মানিকতলা বোমার মামলা অর্থে বৃটিশের বিরুদ্ধে আক্রমণের ষড়যন্ত্রে গ্রেপ্তার ও তাঁর হয়ে আদালতে দেশবন্ধুর ঐতিহাসিক সওয়াল এই অবধি আমাদের মতো কিছু প্রবীণ হয়তো অবগত আছেন। কিন্তু ব্রাত্য একটি অতি স্বল্পালোচিত সময়পর্বকে প্রায় প্রামাণ্য কালখণ্ড বা period piece-এর স্তরে নিয়ে গেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ কাণ্ডে পরে কুখ্যাত হয়ে পড়া বৃটিশ পুলিশ অফিসার চার্লস

টের্গাট, স্টিভেনসন ম্যুর-এর সঙ্গে অরবিন্দ ভ্রাতা বারীন ও অপর আসামি হেম কানুনগোর মতো বিপ্লবী চরিত্রেরা রক্তমাংসে নাটকে হাজির। সুদূর অতীতের হারানো চরিত্রদের যথাযথ কালানুগ সংলাপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা চাট্টিখানি কথা নয়। সঙ্গে রয়েছে সমকালীন দৃশ্যপট। নাটকটি ইতিহাসনিষ্ঠ অবশ্যই। মনে রাখতে হবে সেই সময় মূলধারার কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ যা মূলত বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে বেশি সংঘটিত হোত তা নিয়ে মতবিরোধ ছিল। পরে গান্ধীজী আসার পরে তা আরও তীব্র হয়। বরোদার রাজা প্রদত্ত উচ্চপদ ছেড়ে বাংলায় বিপ্লববাদ সংঘটিত করতে অরবিন্দের আগমনের পর তাঁর সহযোগীদের মধ্যে সম্পর্কের যে টানাপোড়েন তাই এই নাটকের চর্চিত বিষয়। অরবিন্দের চরিত্রে দেবশঙ্কর হালদার আজকাল তাঁর অভিনয় মুন্সীয়ানায় 'সব চরিত্র বাস্তবানুগ' নামক অতি কথনের জন্ম আরও সুনিশ্চিত করেছেন। তাঁর অভিনয় দক্ষতা বাংলা নাটককে ক্রমিক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত মঞ্চে বৃষ্টিপাতের এক অসাধারণ দৃশ্য তৈরি করেছেন নাট্যকার। বারীন ঘোষ রূপী কৃষ্ণেন্দু দেওয়ানজী ক্রমশ নাটকের পর নাটকে নিজেকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন। একই কথা একমাত্র অনৈতিহাসিক চরিত্র পৌলমী সম্পর্কেও। শুধু যে ধন্দটি অনেকের মনেই বারবার ভেসে উঠেছে বা উঁকি দিয়েই প্রকাশ হবার সাহস সঙ্কুলান করতে পারেনি সেই ভারত স্বাধীন হওয়ার পর শ্রী অরবিন্দের অনুভূতি কেমন ছিল তা নিয়ে ব্রাত্যও আলোকপাত করলেন না। নাটকটি দেখা বাঙালি হিসেবে সকলেরই আশু কর্তব্য। ∎

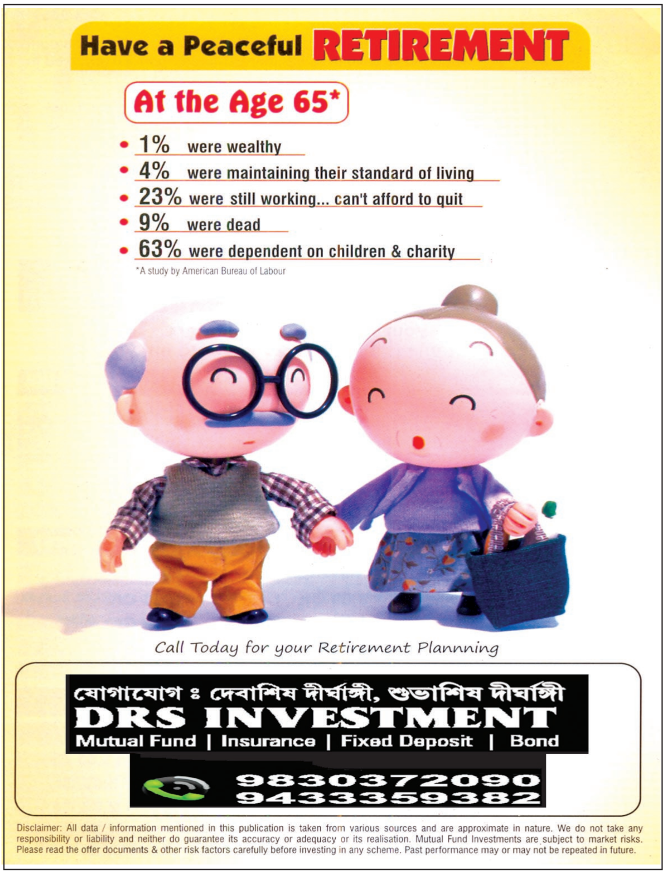

নাসিক-ত্র্যম্বকেশ্বরে পূর্ণকুম্ভমেলা - ২০১৫

১৪ই জুলাই থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্নান চলবে

নাসিক রোড স্টেশন থেকে নাসিক শহর ১১ কিমি ও ত্র্যম্বকেশ্বর আরও ৩৩ কিমি। ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির এবং পাহাড়ের ওপর গোদাবরী নদীর উৎস। মেলা বড় হওয়ায় নাসিক শহরের কাছে রামঘাট গোদাবরী নদীর তীরে বড় মেলা বসে। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য বাড়ি ও হোটেল ভাড়া করা হয়েছে।

স্নানের দিন

১৪ জুলাই মঙ্গলবার সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি প্রবেশ, কুম্ভ আরম্ভ ও ধ্বজা স্থাপন — ৩০০০ টাকা
১৪ আগষ্ট শুক্রবার স্নান — ৩০০০ টাকা (৫ দিন)
১৭ আগষ্ট সোমবার স্নান — ৪০০০ টাকা (৫ দিন)
২৬ আগষ্ট বুধবার স্নান— ৩০০০ টাকা (৫ দিন)
২৯ আগষ্ট শনিবার শাহী স্নান— ৪০০০ টাকা (৫ দিন)
১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার শাহী ও মুখ্য স্নান — ৫০০০ টাকা (৫ দিন)
২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শাহী স্নান — ৪০০০ টাকা (৫ দিন)

ফাঁকা দিনগুলিতে গেলে ২০০০ টাকা করে লাগবে।

জেনে রাখুন কুম্ভের যোগ প্রতি মুহূর্ত, কামনা সঙ্কল্প করে স্নান ও দান করলে ফল হয়। এখন ১২০ দিন আগে রেলের টিকিট দিচ্ছে, টিকিট কেটে রাখুন। রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধুদের বিনা খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনুমতি নিন। বিভিন্ন রামকৃষ্ণ আশ্রম আমাদের কুম্ভমেলা ক্যাম্পে অংশ নিতে পারেন। ছোট জায়গা বলে স্থান সীমিত, সেই কারণে এখনই বুক করুন।

ভক্ত, বন্ধু ও যাত্রীদের কাছে আবেদন সাধু ভাণ্ডারার জন্য দান করুন।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, ৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট (লেনিন সরণী), তালতলা, কলকাতা - ৭০০ ০১৩

ফোন ঃ ০৩৩ ২২৬৫ ৬৭০৪, মো ঃ ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

শব্দরূপ-৭৫৩ শ্যামাপ্রসাদ দাশ

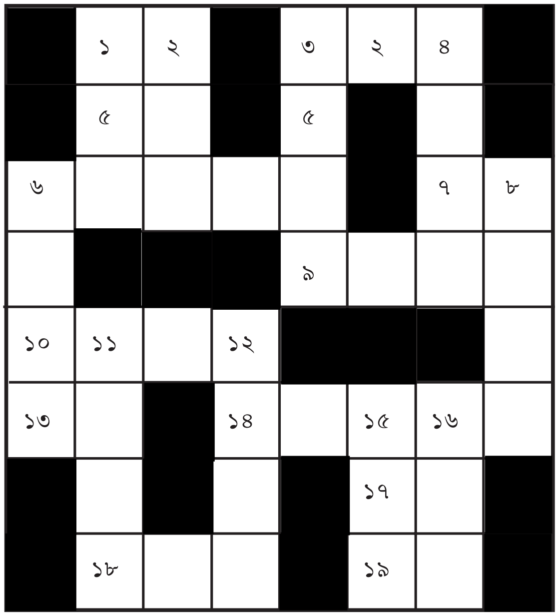

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** উৎকোচ, **৩.** স্বরগ্রামের প্রথম স্বর, 'সা', **৫.** বক্রভাব, **৬.** আশা, সম্ভাবনা, **৭.** কোমর ঘুরিয়ে পরা যায়, **৯.** বর্তমানে এও উৎকোচ, **১০.** ছদ্মনামে সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ, **১৩.** বৃহৎ, দীর্ঘ, **১৪.** স্পৃহাহীন, **১৭.** পটি, **১৮.** শূন্যতা **১৯.** শিবানুচর।

উপর-নীচ : **১.** গন্ধগোকুল, **২.** মার্গ সঙ্গীতের রাগ, **৩.** কুমার কার্তিকেয়, **৪.** নিদান নষ্ট করা, **৬.** প্রশ্রয়, **৮.** 'খোলা—ধারে মাথা রেখে' (সুবীর সেন), **১১.** সঙ্গীতে গায়ক কর্তৃক লয়ের প্রদর্শন, **১২.** রবীন্দ্র উপন্যাস, **১৫.** চন্দ্রাতপ, মণ্ডপ, **১৬.** তারাশঙ্কর কাহিনিতে যমুনা নদী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫০
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
অপূর্ব মাহাতো
পুরুলিয়া

চি	এ	কূ	ট		দা	প	নি
ক			গ	প			চো
চি			রা	ত			ল
ক	ল	গি		এ	স	র	
	ব	র	দ		তী	ব	র
কু			হ	ক			ক্ষ
ন্দ			লা	স			প
র	সা	ল		ম	ধু	ম	তি

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭৫৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৩ জুলাই ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

 ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

 যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

 চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

 ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

 পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

 গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

 স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

 লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

 রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

 লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ৩০

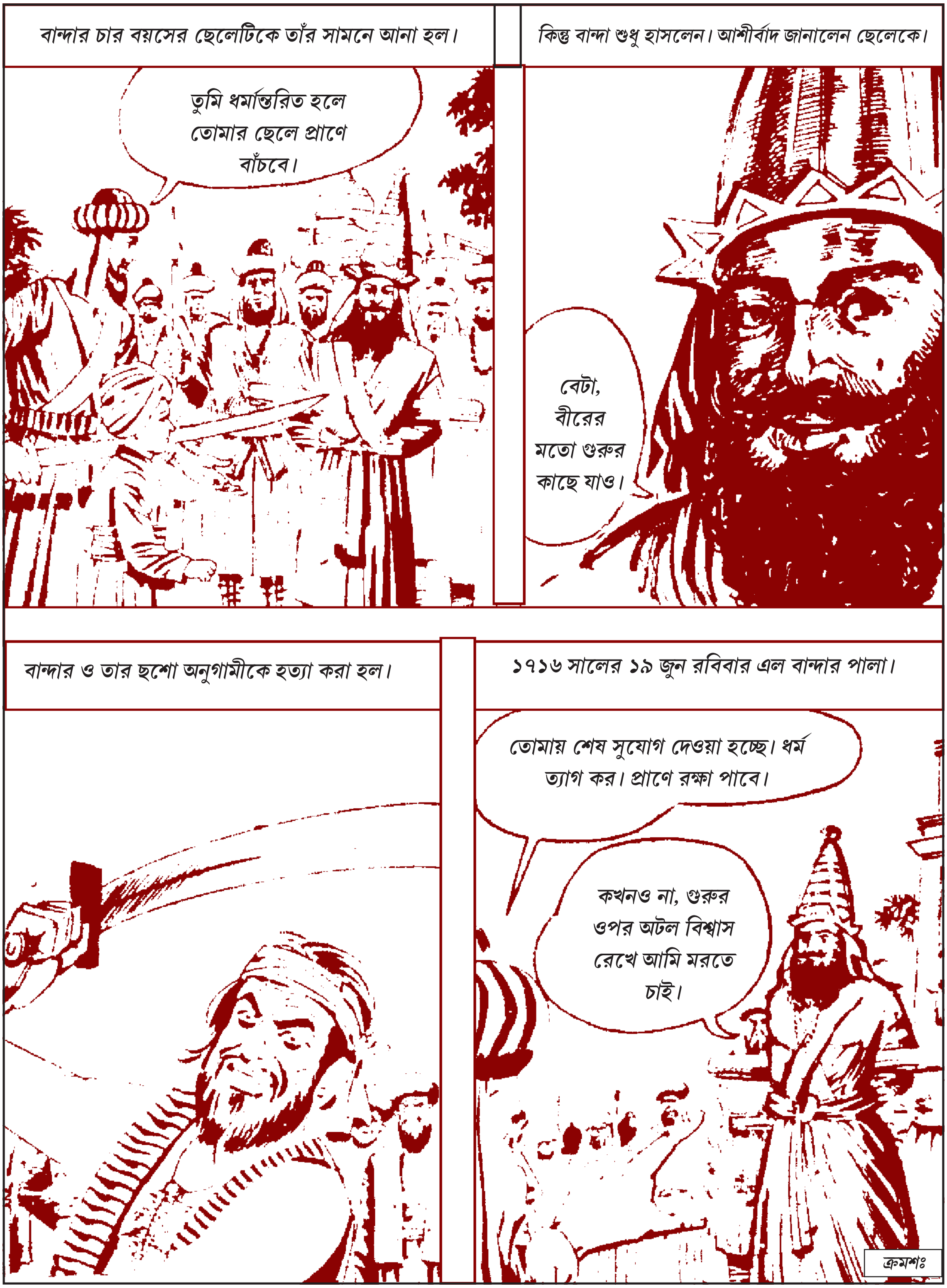

Swastika Weekly. RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
29 June - 2015 - Rs. 10.00